ভ্রাতৃবৃন্দ ও বন্ধুগণ !

শ্রদ্ধেয় মীর ওয়াইজ মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক-এর মুখ থেকে এই মাত্র আপনারা জানতে পারলেন যে, আমি ছত্রিশ বছর পর এখানে এসেছি[1]। শরীর-স্বাস্থ্য ও বয়স যে গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে-তাতে করে ভবিষ্যত সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলা যায় না। সব কিছুই আল্লাহ্‌র মর্যির উপর নির্ভরশীল। ছত্রিশ বছর পূর্বে যখন এখানে এসেছিলাম সে সময় মীর ওয়াইজ হযরত মাওলানা ইউসুফ শাহ (র) জীবিত। আমি তাঁর মেহমান ছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে নতুন দিল্লীতে নিজামুদ্দীন-এর তাবলীগী মারকাযে এবং লক্ষ্ণৌ-এর নদওয়াতুল 'উলামার শিক্ষা কেন্দ্রে। এখানে পা ফেলতেই সেদিনগুলোর কথা আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে, সে সব দৃশ্যও আমার স্মরণ পথে উদিত হচ্ছে যখন তিনি এই জামে' মসজিদের মিম্বর থেকে কুরআন-হাদীছের মণি-মুক্তাসম বর্ষণ করতেন। আজ তাঁর চেহারা আমার মানস পটে দেদীপ্যমান। আমি যখন আসলাম—তখন তিনি তাঁর মহাস্রষ্টা ও মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে পেঁৗছে গেছেন! আল্লাহ্ পাক তাঁর দর্জা বুলন্দ করুন এবং আমাদের বর্তমান মীর ওয়াইজ মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক-এর হায়াত দারায করুন ও তাঁর 'ইল্‌ম ও আমলে তরক্কী দান করুন। আমীন!

ভাইয়েরা আমার !

যে মুসাফির এতদিন পর এল এবং আগামীতে আর আসতে পারবে কিনা একথাও যখন সে সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারে না, আর এমন আশাও যখন অবধারিতভাবে নেই তখন তার পক্ষে আপনাদের খিদমতে কি তোহফা পেশ করা উচিত? এমতাবস্থায় মানুষ তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু স্বীয় হৃদয় ও তার বক্ষ প্রদেশ থেকে বের করে উপহার হিসাবে সবার সামনে রেখে দেয়। এজন্যই চাচ্ছি যে, এই নগণ্য খাদেমের নিকট যে মূল্যবান থেকে মূল্যবানতরো তোহ্‌ফা রয়েছে তাই আপনাদের পেশ করি। মূল্যবান তোহ্‌ফা এ দীন খাদেমের মালিকানাধীন বস্তু নয়, তার ঘরের জিনিসও নয়, এটি সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কালাম-ই-ইলাহীর মাধ্যমে পেয়েছে। আর এই বস্তু কিয়ামত অবধি সেই মহান দরবার থেকেই একজন পায়! হিদায়াতের উৎস একটাই। এজন্য আমি আপনাদের সামনে সবচেয়ে জরুরী পয়গাম এবং সর্বাপেক্ষা জরুরী সবকের পুনরাবৃত্তি করতে চাই।

১, শ্রীনগরের পয়লা সফর ১৩৬৪ হি. রমযান, আগষ্ট ১৯৪৫-এ হয়েছিল।

এখনই জনাব মীর ওয়াইজ কতকগুলো মুবারক নাম উচ্চারণ করেছেন। স সবের ভেতর হযরত আমীর-ই কবীর সায়্যিদ 'আলী হামদানীর পবিত্র নামও রয়েছে।

তাঁর এবং তাঁর সিলসিলার সাথে আমার এক ধরনের পারিবারিক তথা খান্দানী সম্পর্কও রয়েছে। আর তা এভাবে যে, তিনি এবং আমার ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ আমীর-ই-কবীর সায়্যিদ কুত্‌বুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী (র) একই সিলসিলাভুক্ত ছিলেন[1] এবং তাঁর সাথে আমার একটা হৃদয়ের সম্পর্কও অনুভূত হয়। আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি-হযরত মীর সায়্যিদ 'আলী হামদানী (র)-কে খতলান[2] থেকে কোন বস্তু এখানে টেনে এনেছিল? এই সুন্দর উপত্যকার অপূর্ব সৌন্দর্যই কি তাঁকে টেনে এনেছিল? হিমালয় পর্বত শ্রেণীর সমুন্নত শৃঙ্গরাজি এবং এ উপত্যকার শ্যামল সজীবতাই কি টেনে এনেছিল তাঁকে? আপনাদের জানা দরকার যে, তিনি যে ভূখন্ড থেকে এসেছিলেন তাও সৌন্দর্যের আধার ছিল। ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ ছিল তা। তারপরও সে কোন বস্তু যা তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছিল? আপনারা সদা-সর্বদা তাঁর নাম নিয়ে থাকেন। আল্লাহ্‌র শোকর যে, শতাব্দী গুজরে যাবার পরও তাঁর সাথে আপনাদের সম্পর্ক কায়েম আছে, আর আমি মনে করি যে, তাঁর চেষ্টা-সাধনা এবং তাঁর ইখ্‌লাস ও রূহানিয়াত তথা নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিকতার বরকতেই এখনও এখানে ইসলাম নিরাপদ।

১. আমীর-ই-কবীর সায়্যিদ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী (র)-এর মৃত্যু ৬৭৭হি.। আবুল জনাব হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা (মৃ. ৬১০হি.) অন্যতম খলীফা ছিলেন যাঁর সিলসিলায় আমীর 'আলাউদ্দৌলা সিমনানী (র)-এর শাখার সাথে আমীর-ই-কবীর সায়্যিদ 'আলী হামদানীর সাথে (মৃত্যু৭৮৬হি,) সম্পর্কিত ছিলেন। এছিল সুহ্‌রাওয়ার্দিয়া সিলসিলা। কাশ্মীরে একে কুবরোবী, বিহারে ফেরদৌসী এবং দাক্ষিণাত্যে একেই জুনায়দী বলা হয়। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া মুনরী (মখদুম, বিহারী নামে পরিচিত, (মৃত্যু ৭৮৬ হি.) (এ সিলসিলার অন্যতম মহান বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর "মকতুবাত-ই-সাহ্‌সদী" অত্যন্ত বিখ্যাত। (বিস্তারিত জানতে চাইলে ইসলামী রেনেসার অগ্রপথিক, ৩য় খন্ড দ্র.)। (উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ দ্র.)

২. খাতলান মাউরা উনন্নহর এলাকায় সমরকন্দের নিকটবর্তী অনেক গুলো শহরের সমষ্টি। জীহু নদীর উজানে অবস্থিত। এ জেলার একটি জায়গাকে "খাতল" বহুবচনে "খাতলান বলা হয়।

আমি কি আপনাদেরকে বলব, সে কোন বস্তু যা তাঁকে এখানে টেনে এনেছিল? তা ছিল এক সূক্ষ্ম ঈমানী মর্যাদাবোধ। যে স্বীয় প্রেমাস্পদকে যত বেশী ভালবাসে, তার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে যত অধিক পরিচয় হয় এবং তার সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার উপর বিশ্বাস ও ইয়াকীন হয়—তার ভেতর তত পরিমাণ স্বীয় মাহবুব তথা প্রেমাস্পদ সম্পর্কে গায়রত ও মর্যাদাবোধের সৃষ্টি হয়। একজন অজ্ঞ ও জাহিল মূল্যবান মণি-মুক্তা ও জওয়াহেরাতকে একখন্ড ঢেলার ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করে, দামী হীরক খন্ডকে না জানার কারণে ভেঙে ফেলে। কিন্তু জহুরীকে দেখুন, নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় জ্ঞান করে একে কত সতর্কতার সাথে হিফাজত করে সে! ঠিক তেমনি বাগান রক্ষক মালিকে দেখুন, সে কিভাবে একটি ফুলের জন্য নিজেকে কুরবান করে দেয় এবং ফুলের গায়ে সামান্য আঁচড় লাগুক কিংবা দাগ পড়ুক তা সে পসন্দ করে না। বুলবুলকে জিজ্ঞেস করুন ফুল সম্পর্কে, আর পতঙ্গকে জিজ্ঞেস করুন প্রদীপ শিখা সম্পর্কে, 'আশিককে জিজ্ঞেস করুন মা'শূক সম্পর্কে এবং তওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চান তো জিজ্ঞেস করুন আল্লাহর প্রেরিত বাণীবাহক পয়গম্বর ও 'আরিফদেরকে।

আঁ-হযরত (সা) তওহীদের সবচেয়ে বড় আমানতদার ছিলেন। আর ছিলেন এর সবচেয়ে বড় মুবাল্লিগ, দা'ঈ বা দাওয়াতপ্রদানকারী'। মা'রিফাতের অধিকারী সত্তা ও তওহীদের মূলতত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁরই নিয়ে আসা সম্পদ আজও বণ্টিত হয়ে চলেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বণ্টিত হতে থাকবে। আমাদের এবং আপনাদের আঁচলে আল্লাহর ফযলে সে সম্পদই বর্তমান। আঁ-হযরত (সা) (আমার জীবন তাঁর জন্য উৎসর্গীত হোক) আল্লাহ্ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত, আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত, আল্লাহ্‌র সর্বাধিক যাচঞাকারী, আল্লাহ্‌র উপর সর্বাধিক কুরবান তথা জীবন উৎসর্গকারী। এজন্যই তাঁর গায়রত ও মর্যাদাবোধের অবস্থা ছিল এইযে, একবার এক ব্যক্তি কেবল এতটুকু বলেছিল যে—

من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের অনুগত্য করবে সে হিদায়াত পাবে, আর যে ব্যক্তি এতদুভয়ের নাফরমানী করবে সে হবে পথভ্রষ্ট। আঁ-হযরত (সা) এটা বরদাশ্‌ত করতে পারেন নি। তিনি বললেন:

بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله

তুমি দেখছি কথা বলার রীতিও জাননা। (আলাদা আলাদা) এভাবে বল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের নাফরমানী করবে, সে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হবে।[1] ঠিক তেমনি এক লোক বলেছিল ما شاء الله وشئت যদি আল্লাহ এবং আপনি চান (তাহলে একাজ হয়ে যাবে)। একথা শুনে আঁ-হযরত (সা) বললেন, اجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده—তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? না, তুমি এভাবে বল না; বরং বল, যদি একা আল্লাহ্ চান (তাহলে হবে)।[2]

এ হ'ল গায়রত ও মর্যাদাবোধের অবস্থা। একজন সত্যিকার 'আশিকের প্রেম ও মুহব্বতের পরিমাণ হয় যতখানি, ততটাই হয় তার গায়রত ও মর্যাদাবোধ। মর্যাদাবোধ প্রেম ও মুহব্বতের অধীন, অধীন জ্ঞান এবং অকপটতার। যদিও উদাহরণটা শোভন হচ্ছে না, তবু এর থেকে ভাল উদাহরণও পাওয়া যাবেনা। তাহ'ল স্বামী—স্ত্রীর সম্পর্ক কত নাযুক হয় দেখুন দেখি! এই সম্পর্ক কত কাছের, কত স্থায়ী এবং কতটা আন্তরিক এবং হৃদ্যতাপূর্ণ! স্ত্রীর সম্পর্কে স্বামীর এবং স্বামীর সম্পর্কে স্ত্রীর গায়রত ও মর্যাদাবোধ কত বেশী হয়। স্বামী কখনই এটা বরদাশ্‌ত করতে পারে না (যদি সে শরীফ হয়, হয় পৌরুষদীপ্ত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন) যে, তার স্ত্রীর উপর কারুর সামান্য ছায়াও পড়ুক, কারুর সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কও থাকুক কিংবা প্রকাশ পাক কারোর প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও।

হযরত আমীর-ই-কবীর মীর সায়্যিদ 'আলী হামদানী ছিলেন একজন 'আরিফ বিল্লাহ, ওলীয়ে কামিল, 'আশিক-ই-খোদা এবং একজন 'আশিক-ই-রাসূল। আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে, দীনের মিযাজ সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবহিত। চিকিৎসক যেমন হাত ধরে রোগীর নাড়ীর খবর বলে দিতে পারে, তিনি ছিলেন তাই। এজন্য তিনি দীন সম্পর্কে, ইসলাম সম্পর্কে এরূপ গায়রত ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন যে, লাখো কোটি মানুষের মাঝে কদাচিত এরূপ পাওয়া যায়। তিনি শুনতে পেলেন যে কাশ্মীর নামে লম্বা-

---

১. সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, কিতাবুল জুমু'আ-২৮৬ পৃ.।

২. মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ২৮৩ পৃ.।

চওড়া এক বিরাট উপত্যকা আছে। সেখানকার লোকেরা আল্লাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে অনবহিত। সেখানে বিশ্বের স্রষ্টা ভিন্ন ও তাঁর মহিমার সত্তা ছাড়া এবং 'ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু' ব্যতিরেকে আর সব কিছুর পূজা অর্চনা হয়। মূর্তিপূজা করা হয়। কিছু জিনিষ আছে মাটির ভেতর, কিছু আছে যমীনের ওপর, কিছু দাঁড়িয়ে আছে আর কিছু আছে শায়িত অবস্থায়; লোকে যার ভেতরই সামান্য শক্তির বিকাশ দেখতে পায়, দেখতে পায় ভাল-মন্দ কিংবা লাভ-ক্ষতি করবার বিন্দুমাত্রও সামর্থ কিংবা বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে অথবা কিছুটা রূপ অথবা সৌন্দর্য অবলোকন করে—অমনি তার সামনে মস্তক নুইয়ে দেয়। আমার ধারণা যে, যদি তিনি এখানে না আসতেন তাহলে সম্ভবত আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল তাদের কাছে ধরা পড়ত না। কেননা তিনি যেখানে থাকতেন সেখান থেকে নিয়ে এই কাশ্মীর উপত্যকা পর্যন্ত বড় বড় দীনের রূহানী তথা আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ছিল। হিমালয়ের পাদদেশে গোটা ভারতবর্ষই পড়ে ছিল যেখানে হাযার হাযার 'আলিম, শত শত মাদরাসা ও খানকাহ্ ছিল। কিন্তু উন্নত ও বুলন্দ হিম্মতের অধিকারী একজন মানুষ এ দেখে না যে, কেবল আমার একার ওপর এত বড় দায়িত্ব আরোপিত হয় কিনা! এ দায়িত্ব ও অপরিহার্য কর্তব্যকে তিনি তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেন। কেউ তাঁকে হাযারও বাধা দিক, হাযারো প্রতিবন্ধকতা তাঁর পথে কেউ খাড়া করুক, পাহাড় দুর্লংঘ প্রাচীর হয়ে তার রাস্তা আগলে রাখুক, উত্তাল সমুদ্র হোক বাঁধার বিন্ধ্যাচল, তিনি কারোর পরওয়া করেন না। এ ছিল যেন কোন আসমানী আওয়াজ যা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন: সায়্যিদ! ওঠো, কাশ্মীর যাও এবং সেখানে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ ছড়িয়ে দাও!

সায়্যিদ 'আলী হামদানী পরিষ্কার অনুভব করেন যে, আল্লাহর নিকট আমাকে জওয়াবদিহী করতে হবে। ময়দানে হাশর সামনে, আল্লাহর আরশ বর্তমান আর তাঁরই রহমতের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে আম্বিয়া-ই-কিরাম ও আওলিয়াকুল। সেখান থেকে প্রশ্ন ভেসে আসছে: সায়্যিদ 'আলী! তুমি জানতে যে, আমার সৃষ্ট যমীনের একটি অংশে গায়রুল্লাহর পূজা হচ্ছে, গায়রুল্লাহ্‌র সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা হচ্ছে, কামনা ও বাসনার জাল বিছানো হচ্ছে, সব কিছু জেনে-শুনে কিভাবে তুমি তা বরদাশ্‌ত করলে? মীর সায়্যিদ 'আলী হামাদানীর সামনে ছিল এ দৃশ্য। যদি সারা দুনিয়ার 'আলিম-'উলামা ও জ্ঞানী মনীষী একত্র হয়েও তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করতো যে, হযরত! এ প্রশ্ন আপনাকে করা হবে না; তথাপিও

তিনি বলতেন: না, না, আমাকেই করা হবে এ প্রশ্ন। আমার গায়রত, মর্যাদাবোধ ও পৌরুষ এতটুকু সহ্য করতে পারে না যে, আল্লাহর এই বিশাল যমীনের একটি ছোট্ট অংশেও গায়রুল্লাহ্‌র উপর আশা-ভরসা ও ভীতির সম্পর্ক থাকুক, একে মানুষের (চাই কি সে জীবিতই হোক কিংবা মৃত) —ভাগ্য পরিবর্তনকারী মানা হোক, সন্তান-সন্তুতি ও রিয্‌ক প্রদানকারী হিসাবে আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকে বিশ্বাস করা হোক এবং অপর কোন সত্তাকে সব সময় এবং সর্বস্থানে হাযির জ্ঞান করা হোক। যদি আমি জানতে পারি যে, উত্তর মেরু কিংবা দক্ষিণ মেরুতে অথবা হিমালয়ের সমুন্নত ও সবুজ গিরি শৃঙ্গের ওপর এমন একজনও শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী মানুষ আছেন যিনি গায়রুল্লাহর পূজা করছেন, যিনি গায়রুল্লাহকে উপকার কিংবা ক্ষতির মালিক মনে করেন, গায়রুল্লাহকে এই সৃষ্টিজগতের হাকিম তথা শাসক ব্যবস্থাপক মনে করেন তাহলে সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছান আমার জন্য ফরয হয়ে দাঁড়ায়। মনে রেখ, আল্লাহ বলেন:

ألا له الخلق والأمر -

"সৃষ্টি যে মহান আল্লাহ্‌র, হুকুমও তাঁরই"। [সূরা আ'রাফ-৫৪] এমন নয় যে, সৃষ্টি তো তিনি করেছেন, কিন্তু হুকুম চলছে অন্য কারুর। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য অন্য কাউকে হাওয়ালা করে দেননি যে, আমি পয়দা করলাম আর শাসন তুমি চালাও। স্রষ্টাও তিনি,—আর শাসক বরং ব্যবস্থাপকও তিনিই। তাজমহলের মত নয় এ। তাজমহল তৈরী করেন সম্রাট শাহজাহান। তিনি তুর্কিস্তানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে মিস্ত্রী ডেকে নিয়ে আসেন। শিল্পী ও কারিগরেরা তাদের শিল্প ও কারিগরী নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। তারা এসেছিলেন, চলেও গিয়েছেন। এখন তাজমহলে যার যেমন খুশী প্রশাসন চালাক, সিংহাসন পাতুক, ভাঙ্গুক কিংবা বানাক। সৃষ্টি এমন নয়।

এ দুনিয়া তাজমহল নয়। এ দুনিয়া কুতুব মীনারও নয়। এ দুনিয়া'—এর সমস্ত ব্যবস্থাপনা তাঁরই বজ্র মুঠিতে, তাঁরই কুদরতী হস্তে। এখানকার একটি ছোট্ট বিষয়ও তিনি অপর কারো হাওয়ালা করেন নাই।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ "তাঁর সিংহাসন (জ্ঞান) আসমান যমীনসহ সর্বব্যাপী" তাঁর ক্ষমতার অধিষ্ঠান গোটা সৃষ্টি জগতের উপর এবং সমগ্র যমীন জুড়ে তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতার প্রভাব পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর ন্যায় একটি গ্রহই কেবল নয়, সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহ, সমস্ত নক্ষত্র পুঞ্জ গোটা সৌর জগতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সব কিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।[১]

হযরত সায়্যিদ 'আলী হামদানী (র) কে যে জিনিস এখানে টেনে এনেছিল তা ছিল তওহীদের মর্যাদাবোধ। আপনারা এও মনে রাখবেন যে, সায়্যিদ 'আলী হামদানী এই ভূখণ্ডটি তলোয়ারের বলে নয়, প্রেমের জোরে জয় করেছিলেন, রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতার জোরে জয় করেছিলেন, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দ্বারা জয় করেছিলেন, জয় করেছিলেন দরদ দিয়ে। আরবদের এক জলসায়ও আমি একথা বলেছি। আমি বলেছি যে, সেই ব্যক্তির রূহানিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতা কি কেউ পরিমাপ করতে পারবে, পরিমাপ করতে পারবে কি তার প্রভাবের ? যিনি মাত্র তিন বার পরিভ্রমণ করেছেন আর তিন পরিভ্রমণেই গোটা অঞ্চলটিকে তিনি ইসলামের অনুসারী বানিয়ে ফেলেছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, তিনি গোটা কাশ্মীর তিনবার পরিভ্রমণ করেছেন, তন্মধ্যে একবারের ভ্রমণ ছিল সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়টি ছিল কিছুটা ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং তৃতীয় বারের ভ্রমণে তিনি ঘরে ঘরে গিয়েছেন এবং সবাইকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহর এক বান্দা কয়েকজন সফর-সঙ্গীসহ আসছেন এবং গোটা অঞ্চলকে অঞ্চল মুসলমান হয়ে যাচ্ছে ! আল্লাহর ফযলে আজও তারা মুসলমান, আজও তাদের অন্তরে ঈমানের উষ্ণতা বর্তমান এবং দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যা তাদের থেকে তওহীদের এই আমানত ছিনিয়ে নিতে পারে। এমন কেউ নেই যে 'আবদ ও মা'বূদের মধ্যকার বিরাজিত এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে।

ভায়েরা আমার ! মনে রাখবেন, যদি এই ভূ-খণ্ডে কোথায়ও গায়রুল্লাহর পূজা হয়, তার নিকট নিজেদের অভাব-অভিযোগ পেশ করা হয়, তার দরবারে প্রার্থনার হাত বাড়ানো হয়, কোন শির্‌কমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, তাহলে মীর সায়্যিদ 'আলী হামদানীর রূহ তাঁর কবর মুবারকেও কষ্ট পাবে।

এই গায়রত ও ঈমানী মর্যাদাবোধেরই একটি নমুনা ছিল যে, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর পরিবার ও বংশের লোকদের ডেকে জড়ো করলেন এবং বললেন—স্নেহের পুত্তলি সকল ! আমার পিঠ কবর স্পর্শ করবে না যতক্ষণ না তোমরা আমাকে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সান্ত্বনা দিচ্ছ যে, দুনিয়া থেকে আমার বিদায় নেবার পর তোমরা কার 'ইবাদত করবে ? পরিবারের সকলেই দৃঢ়স্বরে বলল, "শংকিত হবেন না, আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমরা আপনার প্রভু প্রতিপালক, আপনার পিতা ইসহাক, পিতৃব্য ইসমা'ঈল এবং পিতামহ ইবরাহীম (আ)-এর একক ও অংশীহীন প্রভুর 'ইবাদত করব।"

قَالُوا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

"তারা বলল : আমরা আপনার 'ইলাহ' এবং আপনার পিতা ইবরাহীম, ইসমা'ঈল ও ইসহাকের যিনি ইলাহ, তাঁর 'ইবাদত করব; তিনি একক ইলাহ, আর আমরা তো তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।" [সূরা আল-বাকারা-১৩৩] আপনি কেন আমাদেরকে এ প্রশ্ন করছেন ? আমাদের সম্পর্কে আপনার মনে এ খটকা কিসের ? আপনি নিশ্চিত থাকুন ! আপনি শৈশবকাল থেকে যেভাবে আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছেন, আমাদের নরম কচি মনে যে তওহীদের পবিত্র বীজ বপন করেছেন, আমরা তা থেকে সরে যেতে পারি না। আমরা আপনার সত্যিকারের মা'বূদ, যিনি একক, তাঁরই 'ইবাদত করব যাঁর ইবাদত করতেন হযরত ইবরাহীম, ইসমা'ঈল এবং ইসহাক।

অতঃপর তিনি নিশ্চিন্ত হলেন এবং খুশী মনে ও প্রফুল্লচিত্তে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। এই যে আওলিয়া-ই-কিরাম, বুযুর্গানে দীন এবং ইসলামের আহবায়ক (দা'ঈ) বৃন্দ-এরা ঐ সব নবীর উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত। ইয়াকূব ('আঃ)-এর পেরেশানী এ বিষয়েই ছিল, না জানি আমার সন্তান-সন্তুতি ও বংশধরেরা শিরক-এর জঞ্জালে সেভাবে আটকে পড়ে যেভাবে শতশত নয়, হাযার হাযার কওম তাদের প্রতিষ্ঠাতা ও দা'ঈদের অবর্তমানে আটকে গেছে।

ভায়েরা আমার ! যা কিছু বলা হ'ল তা মন দিয়ে শুনুন এবং আমল করুন। এ উপত্যকার জন্য মীর সায়্যিদ 'আলী হামদানী (রঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সহযোগিগণ যে তোহফা ও পয়গাম বয়ে এনেছিলেন তা ছিল মূলত তওহীদের সম্পদ। তাকে সযত্নে বুকে তুলে রাখুন। আল্লাহ রাব্বুল 'আ'লামীনকেই এ দুনিয়ার মালিক, ব্যক্তি ও জাতিগোষ্ঠীর উত্থান ও পতনের মালিক, দুনিয়ার সব কিছুর মালিক মুখতার মনে করুন। তাঁরই

আস্তানার পর মাথা নত করুন। তাঁর আল্লাহর এই সমস্ত পয়গামই বহন করে এনেছেন, এ পয়গামই আওলিয়া-ই-কিরাম বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন। এবং এ পয়গামই দুনিয়ার তাবৎ সংস্কারক এবং ইসলামী রেনেসাঁর সকল পতাকাবাহী (মুজাদ্দিদ) প্রতিটি যুগের লোকদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন। বিজয় ও কামিয়াবীর জন্য অপরিহার্য শর্ত এটাই, সম্মান ও শক্তি লাভের শর্তও এটাই। এরই সামনে হস্ত প্রসারিত করুন এবং একেই সযত্নে বুকে তুলে রাখুন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحيوة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ০

যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে; আর এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।" [সূরাঃ আ'রাফ, ১৫২]

সম্ভবত লোকে একথা বলতে পারে যে, আমরা কবে গো-বৎস পূজা করেছি ? এ থেকে আমরা হাজারো বার তাওবা করি। এ ধরণের বোকামী ও মন্দকাজ কি আমরা করতে পারি ? আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নাযিলকৃত গ্রন্থে এই বলে তার জওয়াব দিয়েছেন যে, আমরা এ ধরণের মিথ্যা রচনাকারীদের সাজা দেই। সমস্ত শেরেকী 'আকীদা ও আমলকে এর ভেতর শামিল করে নিয়েছেন যে, শির্ক-এর বুনিয়াদ সব সময়ই মনগড়া কিসসা কাহিনী ও ভিত্তিহীন গল্প-গুজবের উপর হয়ে থাকে। সাধারণত শির্ক ও অলিক কিস্সা যমজ সন্তানের ন্যায় পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে। এজন্যই আল্লাহ পাক শির্ক-এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ

فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ০

"সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন থেকে।" [সূরা হজ্জঃ ৩০]

শির্ককে আল্লাহ তা'আলা তদীয় কিতাবে পরিষ্কার ও খোলাখুলি মহা অপবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ০

"আর যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" [নিসাঃ৪৮]

আমি আপনাদের এ মুহূর্তে সেই মিম্বর থেকে সম্বোধন করছি যে মিম্বর হচ্ছে মিম্বর-ই-রাসূল(সাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত এবং যা মসজিদে নববীর

মিম্বরের চিহ্ন বহন করছে,—এর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে,—সেই মিম্বরের উপর বসে বলছি,—আপনাদের সব সমস্যার সমাধান হবে, আপনাদের সমস্ত বিপদ-আপদ ও অসুবিধা সূর্যালোকে ভোরের কুয়াশা যেমন অপসৃত হয় সেইভাবে অপসৃত হবে, সকল মুসীবত কর্পূরের মত উবে যাবে যদি আপনারা তওহীদের আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন এবং যত দিন পর্যন্ত আপনাদের মাঝে নির্ভেজাল তওহীদের প্রতিষ্ঠা না ঘটছে, সর্ব প্রকার শিরকমূলক ধ্যানধারণা ও কল্পনার অবসান না ঘটছে—হাজারো চেষ্টা সাধনা সত্ত্বেও আপনাদের সমস্যার সমাধান হবে না, একথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। আল্লাহ্‌র সাহায্য ও মদদ যদি আপনাদের অনুবর্তী না হয় তাহলে কোন চেষ্টা-তদবীরই ফলপ্রসূ হবে না। আর তাঁর সাহায্য লাভ ঘটলে আশংকারও কোন কারণ থাকবেনা।

إن ينصركم الله فلا غالب لكم ج وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ط وعلى الله فليتوكل المؤمنون ০

"আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে তোমাদেরকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না। আর আল্লাহ যদি তোমাদেরকে অপদস্থ করতে ইচ্ছা করেন অতঃপর এমন কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে ? আর মু'মিনেরা আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করুক।"

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ০

জাতীয় জীবনে বুদ্ধিজীবীদের স্থান এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

[৩০ শে অক্টোবর রোজ শুক্রবার বাদ—'আসর মীর ওয়া'ইজ মনযিলে 'আলিম-'উলামা, মসজিদের ইমাম ও সমাগত সুধীবৃন্দের সামনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করা হয়]।

জনাব মীর ওয়া'ইজ মওলানা মুহাম্মদ ফারূক সাহেব ও 'উলামায়ে কিরাম! আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি এজন্য যে, যে সব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের খিদমতে আমাকে এক এক করে হাযির হবার দরকার ছিল স্বয়ং তাঁরাই আজ এখানে তশরীফ এনেছেন, আর আমি এক জায়গায় বসে তাঁদের যিয়ারত ও মোলাকাত লাভের সৌভাগ্য হাসিল করেছি। আমি মীর ওয়া'ইজ সাহেবের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, যে দায়িত্ব আমার কাঁধে বর্তে ছিল তার হাত থেকে তিনি আমাকে অত্যন্ত সদয় ও আন্তরিকতার সাথে মুক্তি দিয়েছেন।

সমাগত ভদ্রমন্ডলি! স্বল্প সময়ের মধ্যে এধরনের সম্মানিত সুধী সমাবেশে উপস্থিত সুধীবৃন্দের খেদমতে কি পেশ করব?

আমি একটি হাদীছের সাহায্য গ্রহণ করতে চাই। বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে:

الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد
الجسد كله الا وهی القلب ○

উদ্ধৃত বাক্যের মধ্যে কালামে নবুওতের নূর (আলো) পরিষ্কার চমকাচ্ছে। গভীরভাবে এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন—"মনে রেখ, মানুষের দেহের ভিতর 'গোশতের একটি টুকরো' রয়েছে। টুকরোটি যদি সুস্থ থাকে, তাহলে সারা শরীরই সুস্থ থাকে। আর সেটিতে যদি কোন বিপর্যয় দেখা দেয়, কিংবা অসুস্থ হয়, গোটা শরীরই অসুস্থ বোধ করতে থাকে, পীড়িত হয়ে পড়ে। তোমরা কি জান গোশতের টুকরোটির কি নাম?" এরপর রসূল (সঃ) নিজেই তার উত্তর দেন—"জেনে রাখ, সেটি হচ্ছে কলব (হৃদয়)।" আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি তাহলো এই যে, মানুষের দেহাভ্যন্তরে যে রকম হৃদয় (দিল) থাকে—উম্মাহ্ বা জাতি ও সম্প্রদায়েরও তেমনি একটি হৃদয় থাকে, মানবতারও দিল্ থাকে। আর এই দিল্ মানব জাতির দেহের মধ্যে স্বীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাকে এবং এই মানব জাতি-রূপ দেহের গোটা ব্যবস্থাপনাই এর উপর নির্ভরশীল। এই দিল যদি খারাপ হয়ে পড়ে (এই খারাপের রূপ ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকম হতে পারে), আর এই খারাপ ও বিকৃতির প্রকৃতি যে রকমই হোক না কেন, দিল যখন এই বিকৃতির ফলে প্রভাবিত হয়ে পড়ে, তখন গোটা দেহ-যন্ত্রটাই আর প্রভাবিত না হয়ে পারে না। গোটা দেহের ভারসাম্য হয়ে পড়ে তখন বিপর্যস্ত। শরীরের আগের অবস্থা তখন আর বজায় থাকে না। এ মুহূর্তে আমি মনে করি যে, আমি কাশ্মীরের দিল ও দিমাগ তথা-হৃদয় ও মস্তিষ্ক এই উভয়কেই সম্বোধন করছি। আজ আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন—আমি মনে করি তারা সবাই সাহিবে কলব তথা হৃদয় মনের অধিকারী। আমি অবশ্য আহলে দিল্ বলছি না, কারণ কথাটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ এবং এর মর্মও বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। শায়খ সা'দী (র) صاحب دلے گفته[১] -এর উল্লেখ করলে সম্মার্থে صاحب دلے فرمود[২] কথাটি বলতেন। আহলে দিল যাঁরা তাঁরা তো বিরাট মর্যাদার অধিকারী। আমরা সকলেই অবশ্য আসহাবে কুলূব বা হৃদয়ের অধিকারী। আপনারা চিন্তা করে দেখুন, দিলের পক্ষে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকার জন্য এবং নিজের প্রকৃতিগত ওজীফা, গোশতের একটি টুকরো হিসাবে, দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসাবে, বিরাট নাযুক ও কঠিন দায়িত্ব বটে।

এখন আমি আপনাদের সামনে আরয করতে চাই যে, দিলের জন্য তিনটি বস্তু অপরিহার্য যাতে করে সে তার প্রকৃতিগত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে পারে এবং শরীরের শৃংখলা ও নিয়ম নীতি ঠিকমত বজায় থাকে। প্রথম যেটা দরকার তাহ'ল দিল (হৃদয়, মন, আত্মা, হৃৎপিন্ড) হবে জীবন্ত। শরীরের সমস্ত কিছু নির্ভর করে তার প্রাণ স্পন্দনের উপর। যদি দিলেরই মৃত্যু ঘটে, তাহলেতো আর কোন প্রশ্নের অবকাশই রইল না। জনৈক কবি বলেছেন:

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے
کہ زندگی ہی عبارت ہے تیرے جینے سے

"হে জীবন্ত দিল! আমার ভয় হয় তুমি না আবার মারা যাও। কারণ একমাত্র তোমার বেঁচে থাকার কারণেই এ জীবন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।" প্রথম

---

১. আহলে দিল বলেছেন;
২. আহলে দিল ফরমান;

শর্ত এই যে, দিল হবে জীবন্ত, জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে গভীরভাবে বিজড়িত। দ্বিতীয় কথা হ'ল এই যে, দিলের মধ্যে হরকত থাকতে হবে। হৃৎপিন্ড হবে সচল সক্রিয় ও গতিশীল। হৃৎপিন্ডের এই ক্রিয়া ও স্পন্দন যদি থেমে যায়, আপনারা জানেন, তাহলে হৃৎপিন্ডও শেষ হয়ে যাবে—সেই সঙ্গে খতম হবে শরীরও। এর পর জীবনের আর কোন প্রশ্নই থাকবে না। হৃৎপিন্ডকে সচল সক্রিয় ও গতিশীল রাখবার জন্য কি কি কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে? বলা যায়—চিকিৎসার মাধ্যমে শারীরিকভাবে অঙ্গের পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং যান্ত্রিক উপায়ে[১] হৃৎপিন্ড সচল রাখা যায়। আপনারা সবাই জানেন যে, হৃৎপিন্ডকে সচল ও সক্রিয় করে তুলবার জন্য যেভাবে একজন মানুষ স্বীয় জীবনের জন্য হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে, ঠিক তেমনি একজন ডাক্তার বা চিকিৎসক এবং হার্ট স্পেশ্যালিস্ট হৃৎপিন্ড সচল ও সক্রিয় করে তুলবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করে? তারা চেষ্টা করে যে কোনভাবে কিংবা যে কোন উপায়ে হৃৎপিন্ডকে একবার সচল ও সক্রিয় করে তুলতে, এরপর চেষ্টা করে সেই সচল ও সক্রিয় অবস্থা বাকী রাখতে। তৃতীয় শর্ত এই যে, হৃৎপিন্ডের মাঝে উত্তাপ থাকবে। তা যেন নিরুত্তাপ ও ঠান্ডা না হয়ে যায়। দেখা গেল অপরিহার্য তিনটি শর্ত হ'ল, জীবন, সচল গতিশীলতা ও উত্তাপ।

এখন আমি আরয করব যে, দেশের যে অংশে এবং যে জাতি, সম্প্রদায় কিংবা যে পরিবারেরই তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হোন না কেন—তার জন্যও এই তিনটি শর্তই অপরিহার্য। প্রথমত, তিনি যিন্দা দিল হবেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সচল ও সক্রিয় হবেন। তৃতীয়ত, তার ভেতর উত্তাপ থাকতে হবে। এর ভেতর কোন একটিও যদি চলে যায় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক যদি জীবন ও যিন্দেগী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে সাধারণের অবস্থা কি হবে আপনারা তা অনুমান করতে পারেন। মনে করুন, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় (elites) -এর উদাহরণ ঠিক পাওয়ার হাউজের ন্যায়। মুসলিম মিল্লাত এবং যে মিল্লাত অদ্যাবধি টিকে রয়েছে নিজস্ব এই পাওয়ার হাউজের সম্পর্কের কারণে—তার পাওয়ার হাউজ কখনো বন্ধ হয়নি, পরিত্যক্ত হয়নি। অনেক সময় আপনারা দেখতে পান, কিছুক্ষণের জন্য পাওয়ার হাউজ আপনাদের শহরে কর্ম বিরতি পালন করে এবং তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক তারের ভেতর বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সর্বত্র অন্ধকারে ছেয়ে যায়,

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ pace maker-এর আবিষ্কার এতদুদ্দেশ্যেই;

বিরাজ করতে থাকে থমথমে অবস্থা। মিল্লাতের পাওয়ার হাউজ এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ তথা তার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ইতিহাস আমাদেরকে বলে দেয় যে, কোন যুগেই মুসলিম মিল্লাতের এই পাওয়ার হাউজ বন্ধ হয়নি। মুসলিম উম্মাহ্‌র ধারাবাহিকতার ইতিহাস বস্তুতপক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতার ইতিহাস। আপনি যদি একটু গভীরভাবে দেখতে চান তাহলে আপনারা যাকে মুসলিম মিল্লাতের অমরত্ব ও স্থায়িত্বের ইতিহাস বলেন তা মুসলিম মিল্লাতের এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ তথা এই বুদ্ধিজীবী (elites) সম্প্রদায়ের অমরত্বের ও ধারাবাহিকতার ইতিহাস। মিল্লাতের ভেতর প্রতিটি যুগেই এমন লোক বর্তমান ছিলেন যাঁরা স্বয়ং নিজেরা জীবিত ছিলেন, ছিলেন সচল ও গতিমান, উষ্ণ উত্তাপের অধিকারী তাঁদের কারণেই মিল্লাতের শিরা উপশিরায় রক্তের বন্টন সঠিকভাবে সম্পন্ন হ'ত। আপনারা জানেন যে, হৃৎপিন্ড রক্ত বণ্টন করে এবং তাঁর কারণে এরক্ত শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়। মিল্লাতের হৃৎপিন্ড কখনো এবং কোন পর্যায়েই তাঁর কাজ বন্ধ করে নি। মিল্লাতের উপর যে অবনতি দেখা দিয়েছে এবং মিল্লাত যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার কারণ এইযে, তার পাওয়ার হাউজ বন্ধ হয়ে গেছে। আপনারা খৃষ্টান জাতির ইতিহাস পড়ে দেখুন, য়াহুদী জাতির ইতিহাস পাঠ করুন, জানতে পাবেন যে, বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত আম্বিয়া-ই-কিরাম ('আ)-এর বিদায় নেবার অত্যল্পকাল পরেই ইসরাঈলী পাওয়ার হাউজ কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল। কি ছিল সে কাজ? আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্ম-খতিয়ানের কাজ, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ-এর কাজ, হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদ করার কাজ এবং নিষ্কম্প আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, হক-কথা যথাযথভাবে বলা—তাতে কেউ খুশীই হোক আর কেউ বেজারই হোক (তাতে কিছু আসেনা)। বনী ইসরাঈলের ইতিহাস বলে, এই পাওয়ার হাউজ তার কাজ পরিত্যাগ করেছিল। কুরআন মাজীদ তার সাক্ষী।

"ঈমানদারগণ! (কিতাবধারীদের ভেতর) বহু 'আলিম ও সাধু-দরবেশ (আহবার ও রুহবান) জনগণের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করত এবং লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে দিত।" (সূরা তওবা: ৩৪) এর থেকে বড় সাক্ষ্য আর কিছু হতে পারে না যে, বনী ইসরাঈলের পাওয়ার হাউজ কি ছিল? তারা ছিলেন তাদের 'আহবার ও রুহবান', তাদের 'আলিম-উলামা ও সাধু দরবেশগণ। আজকের পরিভাষায় এবং ইসলামী পরিভাষায় আপনি যদি 'আহবার' ও রুহবান'-এর তরজমা করেন তাহলে এর তরজমা হবে—'আলিম-'উলামা ও পীর-বুযুর্গ'ই সাধারণ জনগণের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে না-হকভাবে ভক্ষণ করত এবং লোক-

দেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দিত, অর্থাৎ যে কাজ করবার দরকার ছিল সে কাজ তারা করত না। কিন্তু যা করার প্রয়োজন ছিল না, সমীচীন ছিল না, তাই তারা করত। এর অর্থ একমাত্র এই হতে পারে যে, পাওয়ার হাউজ তার আসল কাজ ছেড়ে দিয়ে ছিল। তার মৌলিক কর্তব্য কর্ম সম্পাদন থেকে সে সরে দাঁড়িয়েছিল, পরিবর্তে অন্য কাজ শুরু করেছিল। যে কনেস্টবল কিংবা পুলিশ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে সে যদি তার স্থান পরিত্যাগ করে এবং পানি পান করাতে থাকে, হারিয়ে যাওয়া পথিককে পথের সন্ধান বাৎলাতে থাকে তাহলে যাত্রীদের ভেতর টককর লাগবে, গাড়ীতে গাড়ীতে হবে সংঘর্ষ, একটা দুটো নয়, বহু দুর্ঘটনাই ঘটবে। যদিও সে ভাল কাজই করছে, পুণ্যের কাজ করছে, খুব ছওয়াবের কাজ করছে। পিপাসার্তকে পানি পান করাচ্ছে, রাস্তার সন্ধান বাৎলে দেবার জন্য বহুদূর অবধি গমন করছে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও সে শাস্তির হকদার হবে যদি সে তার আসল কাজ ছেড়ে দেয়, সে তার ডিউটি ছেড়ে দেয়। 'আলিম—'উলামা ও পীর বুযুর্গের কি কাজ ছিল? তাঁদের কাজ ছিল আল্লাহর উপর ভরসা করা, যুহদ ও অল্পে তুষ্টির জীবন যাপন করা, অন্য পকেটের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করা, অন্যের সম্পদের দিকে দৃকপাত না করা এবং যা পাওয়া গেল তারই উপর শোকর গুযারী করা। কিন্তু তারা কি করল? يأكلون أموال الناس بالباطل তারা অন্যায়ভাবে না-হক পন্থায় লোকের সম্পদ ভক্ষণ করতে শুরু করল। নিজেরা মেহনত করত না, অন্যের পরিশ্রম থেকে ফায়দা লুটত। অন্যদের মেহনত কি? নিজের এবং নিজের বাল-বাচ্চাদের উদর পূর্তির জন্য দৌড়-ধাপ কিংবা ছোটাছুটি করা। তাদের পরিশ্রম থেকে এই সব 'আলিম ও পীর নিজেরা তো মুফ্‌ত ফায়দা লুটত, কিন্তু তাঁদের নিজেদের যে মেহনত ছিল, তারা পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে মেহনত করেছিল, 'ইল্‌ম হাসিল করতে যে মেহনত করেছিল, তার অর্জিত ফসল তারা লোককে দিত না। নিজের পরিশ্রম লব্ধ ফসলে তারা জনগণকে শরীক করত না। উল্টো জনগণের মেহনত লব্ধ ফল ফসলের উপর তারা এমনভাবে কর্তৃত্ব জাঁকিয়ে বসত যে, তার একটা বিরাট অংশই তাঁদের সেবাই উৎসর্গ হয়ে যেতো। ويصدون عن سبيل الله তাঁদের কাজ ছিল, মৌলিক দায়িত্ব ছিল লোকদের রাস্তা বাতলানো তথা পথ প্রদর্শন। তাঁরা এর বিপরীতে লোকদের পথভ্রষ্ট করতে

লাগল অর্থাৎ তারা নিজেদের পথ-প্রদর্শকের সারি থেকে সরিয়ে পথ-ভ্রষ্টকারীর ভূমিকায় নামিয়ে দিল। আপনারা যদি বিভিন্ন মিল্লাত তথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইতিহাস পড়েন তাহলে আপনারা জানতে পাবেন যে, তাদের পাওয়ার হাউজ প্রথমে বন্ধ হয়েছে, এরপরেই কেবল মিল্লাতের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, বিকৃতি এসেছে।

এটাই সব জাতির ইতিহাস, সকল সম্প্রদায়ের ইতিহাস। কিন্তু মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাস এর থেকে স্বতন্ত্র। আমাদের ইতিহাস এই যে, সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততম যুগেও আমাদের পাওয়ার হাউজ তার কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত হয়নি, আরোপিত দায়িত্ব পালন থেকে ক্ষণেকের তরেও বিমুখ হয়নি। আর এমন এক ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে এক্ষেত্রে যে, যদি কেউ এ ব্যাপারে কোন কসমই খেয়ে বসে তাহলে তাঁকে কসম ভঙ্গকারী হিসাবে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। আমি যদি বলি যে, এই মিল্লাতের ইতিহাসে একটি মাসও এমন অতিক্রান্ত হয়নি যে মাসে তার পাওয়ার হাউজ একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল, এবং আল্লাহর এমন কোন বান্দা মুসলিম বিশ্বের কোন অংশে, কোন ভূখণ্ডে ছিলনা যিনি হককে হক বলতেন, বাতিলকে বাতিল। তাহলে একথা ঠিক বলা হবে না। এর সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য-প্রমাণ সিহাহ্ সিত্তায় বর্ণিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর নিম্নোক্ত হাদীছটি ঃ

لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها

"আমার উম্মতের ভেতর প্রতিটি যুগে এমন একদল অবশ্যই থাকবে যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, থাকবে সুদৃঢ়। অন্যে যতই বিরোধিতা করুক না কেন, আর কেউ তাদের সাহায্য নাই বা করুক, কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না"।[১]

কোন এলাকা কিংবা অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বিপদ হ'ল এই যে, সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা বুদ্ধিজীবি ও নেতৃস্থানীয় সম্প্রদায়, যারা সে সমাজের হৃৎপিণ্ড সদৃশ, চাই তা মুর্দাই হয়ে যাক অথবা তা নিষ্প্রাণ ও নিশ্চলই হয়ে যাক কিংবা খতম হয়ে যাক তার উষ্ণ উত্তাপ, ব্যস! আমাদের এখন এটাই দেখতে হবে যে, এই তিনটি শর্ত আমাদের ভেতর

১. সুনান-ই-ইবনে মাজা।

পাওয়া যায় কি না? জীবন, ক্রিয়া, উত্তাপ। যদি জীবন থাকে, কিন্তু জীবনের ক্রিয়া না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, আমাদের জীবনে স্থবিরতা ও জড়তা পয়দা হয়ে গেছে। এর উদাহরণ প্রবহমান পানির ন্যায়। প্রবহমান পানি যেমন থেমে যাবার পর খারাপ ও দূষিত হতে শুরু করে এবং তার ভেতর দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়—ঠিক তেমনি আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনেও বিপর্যয় এসে দেখা দেবে। তিন নম্বর কথা হ'ল এই যে, আপনার ভেতর উত্তাপও থাকতে হবে। অর্থাৎ আপনার ভেতর আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক, 'ইশ্‌ক-ই-রাসূল, আল্লাহর দীদার তথা সন্দর্শন এবং জান্নাত লাভের প্রতি প্রবল আগ্রহ, ঈমানের শক্তি এবং হক কথা বলার মত সাহস থাকতে হবে। এরপর কেউ হাজারো ষড়যন্ত্র করুক এই দেহকে খারাপ করবার জন্য, দেহ খারাপ হবে না। কিন্তু কলব তথা হৃৎপিন্ড যদি তার ক্রিয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে দুনিয়ার তামাম রাষ্ট্র ও সমস্ত শক্তি এক জোট হয়েও এই দেহকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। যেমন, কোন বৃক্ষের যদি একবার জীবনী শক্তি ফুরিয়ে যায় তাহলে হাজারো বালতি পানি ঢেলেও আপনি তাকে তরতাজা ও সবুজ শ্যামল রাখতে পারেন না, অল্প দিনেই তা শুকিয়ে যায় এবং জ্বালানী কাঠে পরিণত হয় (জাতীয় জীবনের উদাহরণও ঠিক তেমনি)।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী!

ইতিহাস আমাদের বলে যে, ভারতবর্ষে প্রতি যুগেই এমন সব লোক গুজরে গেছেন যারা হক-কথা বলতেন। তাদের ভেতর প্রাণের উত্তাপ। ছিল, অবশিষ্ট ছিল তাদের ভেতর ঈমানের উত্তাপ এবং প্রেমের উষ্ণতা। যে কোন লোকই তাঁদের নিকট বসত সেই প্রভাবিত হত। তাঁদের পাশ্বর্ অতিক্রমকারীও এর থেকে বঞ্চিত হত না। তারাও এর পরশ অনুভব করত। তাদের শরীরও বিদ্যুতায়িত হত।। আপনারা তাসাওউফের ইতিহাসে এবং সুফিয়া-ই-কিরামের আলোচনায় সচরাচর শুনে থাকেন যে, তাঁদের ভেতরও আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল ও নির্ভরশীলতার পরিবর্তে একে অপরের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা, সক্রিয়তার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছিল এবং তাঁরা রসম-রেওয়াজের পূজারী হয়ে গিয়েছিল। এসব অবশ্য পরের কথা এবং বিশেষ স্থান কাল বা পাত্রের ভেতর সীমাবদ্ধ। আমরা ভরাতীয় উপমহাদেশের সুফিয়া-ই-কিরাম ও মাশাইখদের দেখতে পাই যে, তাঁদের মাধ্যমে সাধারণ গণ মানুষের মধ্যে ঈমান ও আমলের একটি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হত। যদি কোন শহরে এধরনের একজন মানুষও পাওয়া যেত তাহলে তাঁর বদৌলতে সে শহরে অলসতা, অন্ধত্ব

ও মূর্খতা, আল্লাহ বিস্মৃতি, বিত্ত-পূজা, সুবিধাবাদ ও সুযোগ-সন্ধানী মানসিকতার পরিপূর্ণ আক্রমণ হতে পারত না। এমনও হতে পারত না যে, তাঁর উপস্থিতিতে গোটা সমাজ এসব ব্যাধির শিকারে পরিণত হবে এবং এর স্রোতে ভেসে যাবে। এমনটি হত না। একজন মানুষ বসে আছে, আল্লাহ্‌র বান্দা, আর গোটা শহরে এক ধরনের উত্তাপ ও উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছে। হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া দিল্লীতে এসে বসলেন। মনে হচ্ছিল যে, সারা পৃথিবীর কেন্দ্র-বিন্দু বুঝি এটাই। কি সরকার, কি দরবার, আমীরই কি আর উযীরইবা কি, কবি কি আর সাহিত্যিকই কি, আর কিই-বা আলিম; তামাম মাখলুক যেন তাঁর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এরপর এল খাজা নাসীর উদ্দীন চেরাগে দিল্লীর যুগ। সমগ্র পরিবেশ তাঁর আলোকোত্তাপে প্লাবিত ও উত্তপ্ত হয়ে গেল। প্রতিটি শহরের অবস্থাই ছিল তাই। আপনারা আপনাদের এই কাশ্মীরের অবস্থাই দেখুন না! এখানে আল্লাহ্‌র এক সিংহ শার্দুল আসলেন। হযরত আমীর-ই- কবীর সায়্যিদ 'আলী হামদানী (র)-এর কথাই বলছি। তিনি এসেই গোটা অঞ্চলটাকে মুসলমান বানিয়ে ফেললেন। আজও তাঁর খুলুসিয়াত তথা অকপট নিষ্ঠার বরকতে, তাঁর লিল্লাহিয়্যাত-এর বরকতে সমস্ত রকমের খারাবী সত্ত্বেও এখানে মুসলমান আছে। কি ছিল তা? সেই হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া ও উত্তাপ। একটি হৃৎপিন্ডের শক্তি ও ওজনই বা কতটুকু? আপনারাই দেখুন, শরীর কত বড়, আর সে তুলনায় হৃৎপিণ্ড কত ছোট! কিন্তু গোশ্‌তের এই ছোট্র টুকরোটিই গোটা দেহের উপর রাজত্ব চালায়। এবং সমস্ত শরীরে ভাল-মন্দ সব কিছু এর সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা সমাজ ও জাতির শ্রেষ্ঠতম সন্তান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থিব-প্রীতি ও বিত্ত-পূজার আগমন এবং তাদের ভেতর নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া প্রকৃত বিপদের সংকেত দেয়।

আমি একটি ঘটনা বলছি। একজন বুযুর্গ আমাকে ঘটনাটা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন যে, হায়দরাবাদে একবার এক বুযুর্গের হাঁটুতে ব্যথা হ'ল। আমি তাঁর হাঁটুতে ব্যথার মলম মালিশ করছিলাম। বুযুর্গের বিরাট ভক্ত, খাদেম ও মুরীদকুল যখন মজলিসে বসত তখন এরূপ নিশ্চুপ ও আদবের সঙ্গে বসত যে, মনে হ'ত সবার মাথায় পাখী বসে আছে (كَأنَّ عَلَى رُؤسِهِمُ الطَّيْر)। হযরত বলেন আর সবাই মন দিয়ে শোনে। সে দিন জানিনা কি হ'ল, একজন কথা বলে এক জায়গা থেকে তো অন্য খান থেকে আরেকজন তার কথা কেটে দেয়, একজন কথা

বলল তো সঙ্গে সঙ্গে অন্য কেউ উত্তর দেয়, এইভাবে কথার গুঞ্জন ও বাদ-প্রতিবাদের ফলে মনে হচ্ছিল যেন এ কোন বুযুর্গের মজলিস নয়; বরং এখানে যেন কোন বাজার বসেছে আর আমরা সে বাজারের কেউ ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা। এ যেন মাছের কিংবা সবজির বাজার; ক্রেতা ও বিক্রেতার হাঁক-ডাকে সরগরম। আমার খুব আশ্চর্য লাগল, আজকে হ'ল কি? এ কি নতুন কথা যে, এখানে বুযুর্গ তাঁর পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সহকারে স্বয়ং সশরীরে বর্তমান, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যেন লোকের কোন অনুভূতিই নেই তারা কোন বুযুর্গের সামনে বসে আছে। তিনি আমাকে বিস্মিত হতে দেখে পুনরায় তাঁর হাঁটুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমি মনে করলাম বুঝি সেখানে বেশী ব্যথা করছে। আমি সেখানে বেশী করে মালিশ করতে লাগলাম। এর পর আমার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়তে লাগল, যখন দেখলাম যে, এর পরও লোকের থামার এবং নীরব হবার কোন লক্ষণ নেই। তিনি আবার তাঁর হাঁটুর দিকে ইশারা করলেন। আমি সেদিকটাই মালিশ করতে থাকলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না আসলে ব্যাপারটা কি? সে সময় উক্ত বুযুর্গ আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, হাঁটুর ব্যথার কারণে আমি রাত্রের নির্ধারিত আমলগুলো পুরো করতে পারিনি। তারই বরকতশূন্যতা ও অশুভ লক্ষণের প্রকাশ এভাবে দেখতে পাচ্ছ।

এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি যে, একজন বুযুর্গের তাঁর নির্ধারিত আমলগুলো ছেড়ে দেবার পরিণতি যদি মাহফিলে এভাবে প্রকাশ পায় তাহলে অধিক সংখ্যক বুদ্ধিজীবির তাদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মগুলো পরিত্যাগের পরিণতি সমাজ ও পরিবেশের উপর কি হবে? আপনারা হিসাব কষে বলুন যে, একের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া যদি এতটা হয় তাহলে চার জনের কতটা হবে? আট জনের কত? পঞ্চাশ জনের? আল্লাহ না করুন, যদি কোন জায়গার সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিও বুদ্ধিজীবিই এমন হয়ে যায় তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? মরহুম আকবর ইলাহাবাদী এ অবস্থাদৃষ্টে বলেছেন:

رحم کر قوم کی حالت پہ تو اے ذکر خدا
بے ادب ہو گئی محفل تیرے اٹھ جانے سے

"হে আল্লাহর যিক্‌র! এ জাতির অবস্থার উপর দয়া করুন,
আপনার অবর্তমানেই এ মাহফিল শিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে।"

যখন সাধারণ মানুষ তাদের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বেলায় দেখতে পাবে যে, তাঁদের ভেতরও সম্পদের প্রতি মোহ ও আকর্ষণ ঠিক ততটাই যতটা তাদের নিজেদের ভেতর, পদমর্যাদা ও সম্মান লাভের গুরুত্ব তাঁদের নিকট ততটুকুই যতটা আমাদের ভেতর, তাহলে বলুন, জনসাধারণের উপর এর কি প্রভাব পড়বে?

কোন এক যুগে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তো অবস্থা ছিল এই যে, আল্লাহর এক বান্দা এক জায়গায় বসে আছেন আর তিনি সেখানকার বাদশাহ এবং স্থানীয় শাসকের দিকে মুখ তুলেও চাইছেন না। একজন বুযুর্গের ঘটনা বলি। তাঁর নাম শায়খুল ইসলাম 'ইযযুদ্দীন ইব্‌ন আবদুস সালাম। সুলতানুল উলামা ছিল তাঁর উপাধি। সে যুগের সব চেয়ে বড় শাফিঈ আলিম ছিলেন তিনি। দামিশ্‌কে বাস করতেন। একবার খুতবার ভেতর বাদশাহ্‌র কোন ব্যাপারে তিনি সমালোচনা করেন। বাদশাহ এতে মনঃক্ষুণ্ণ হন। তিনি শায়খ (র)-এর সঙ্গে এমনতরো আচরণ করেন যা কোন 'আলিমের সঙ্গে করা শোভন ও সমীচীন ছিল না। তিনি তাঁকে উপেক্ষা করে এবং এড়িয়ে চলতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে কোথাও থেকে বাদশাহ্‌র একজন সম্মানিত মেহমান এসে উপস্থিত হন। তিনিও ছিলেন তার এলাকার একজন বাদশাহ ও শাসক। মেহমান তার মেযবানের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম শায়খ 'ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম কে চিনতেন এবং এও জানতেন যে, আজকাল তিনি (শায়খ) বাদশাহ্‌র ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। তিনি তার মেযবানকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার দেশে এঁর মত কোন আলিম হলে আমরা তাঁকে মাথায় তুলে রাখতাম। অথচ কি আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এখানকার এমন একজন আলিমের সঙ্গে আপনি এরূপ আচরণ করছেন! অবশ্য বাদশাহ এতে কিছু মনে করেন নি। তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন। সে যাই হোক, বাদশাহ বাদশাহ্‌ই। তার খেয়াল হ'ল যে, আমি যদি এভাবেই চুপচাপ শায়খ (র.)-এর কাছে মাফ চেয়ে নিই এবং বলি যে, আমারই ভুল হয়েছে, তাহলে আমি ছোট হয়ে যাব এবং আমার ব্যক্তিত্বের ভীতিকর প্রভাব কমে যাবে। তিনি তার জনৈক নিকটজনকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, দেখ! তুমি শায়খ (রহ) কে গিয়ে একথা বলবে যে, আমি যে কোন মজলিসে উপবেশনরত অবস্থায় তিনি যেন আসেন এবং আমার হস্ত চুম্বন করেন (এভাবে তিনি যেন বাদশাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করেন)। এতে আমার সম্মানও বজায় থাকবে এবং লোকেও তা দেখবে। এরপর ক্রমান্বয়ে উভয়ের মাঝে সদ্ভাব ফিরে আসবে, পূর্বেকার অসন্তোষ এবং মনোমালিন্যও দূর হয়ে যাবে। শায়খ (র.) কে গিয়ে কেউ একথা জানালে তিনি বলে ওঠেন, জানি না

তোমরা কোন্ কল্পনার মাঝে ডুবে আছ। আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, আমি তো এতেও রাযী নই যে, তিনি এসে আমার হস্ত চুম্বন করুন। সেখানে আমি গিয়ে তার হস্ত চুম্বন করব সেতো আরও অসম্ভব! তাঁর কথিত উক্তি হুবহু সংরক্ষিত রেখেছে ইতিহাস। (তাঁর ভাষায়ঃ لا ارضى ان يقبل يدى افضلا عن ان اقبل يده) ঠিক তেমনি আমাদের রাজধানী এই দিল্লীর (যাঁদের দিল্লীর প্রকৃত সুলতান বলা চলে) শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ মাশাইখ-এরও অবস্থা ছিল এ রকম।

দিল্লীর বাদশাহ একবার হযরত মির্যা মাজহার জানে জানাঁকে বলেন, "আল্লাহ আমাকে বিরাট সম্পদ দান করেছেন, রাজ্য দিয়েছেন, দিয়েছেন রাজত্ব। কিছু কবুল করুন।" তিনি বললেনঃ আল্লাহ বলেছেন, قل متاع الدنيا قليل "বল, (হে রসূল!) দুনিয়ার সম্পদ বড় স্বল্প।" সেই স্বল্প সম্পদের ভেতর একটা ছোট্ট টুকরো হ'ল হিন্দুস্থান। এর ভেতরকার একটি ছোট্ট টুকরো আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন [সেই যুগের প্রচলিত একটি বিখ্যাত প্রবচন ছিলঃ সালতানাতে শাহ আলম, দিল্লী থেকে পালাম অর্থাৎ সম্রাট শাহ আলমের সাম্রাজ্য দিল্লী থেকে পালাম (বর্তমানে বিমান বন্দর) পর্যন্ত বিস্তৃত]; এই ছোট্ট ও ক্ষুদ্র অংশটুকুও যদি ভাগ-বাটোয়ারা করতে গিয়ে শেষ হয়ে যায় তাহলে আর থাকবে কি?

একবার বাদশাহ তাঁকে বললেনঃ আমি আপনাকে কিছু টাকা দিতে চাই। মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন। তিনি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। বাদশাহ বললেনঃ আপনি নিজে না নেন, গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দিন। হযরত মির্যা বললেনঃ দেখুন, টাকা-পয়সা কাজে লাগাবার নিয়ম-রীতি আমার জানা নেই। তার চেয়ে বরং আপনিই আপনার লোকদের দিয়ে বিতরণ করে দিন। এখান থেকে বিতরণ করতে শুরু করুন। দেখবেন কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতে সব ফুরিয়ে যাবে। যদি না ফুরোয় সেখানে গিয়ে দেখবেন ঠিকই ফুরিয়ে গেছে। এধরনের শত শত কিস্‌সা ছড়িয়ে রয়েছে। এসব হ'ল সে সব লোকের উদাহরণ যাঁরা সাধারণ মানুষের দিলে উত্তাপ সঞ্চার করতেন। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, পার্থিব সম্পদের প্রতি প্রেম ও আকর্ষণ মানুষের প্রকৃতিগত وانه لحب الخير لشديد "সম্পদের প্রতি মোহ ও ভালবাসা তার মজ্জাগত।" কিন্তু এর মুকাবিলায় যখন এসব দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, ভেসে ওঠে নিরাসক্ত মনেরও নিস্পৃহ মানসিকতার, পার্থিব জাঁকজমক ও পদ মর্যাদার প্রতি নির্লোভ উদাসীনতার ছবি, তখন মানুষের ঈমান জীবন্ত ও সজীব হয়ে উঠত এবং দুর্দমনীয় লোভ প্রতিরোধ করবার শক্তি

আমাদের মাঝে জেগে উঠত। অতঃপর মুসলিম সমাজ আর খড়-কুটোর মত ভেসে যেত না, যেভাবে আজ তারা ভেসে যাচ্ছে।

নেতৃস্থানীয়, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর জন্য কেবল জীবন ও তার স্পন্দনই যথেষ্ট নয়, তাদের জন্য উত্তাপও প্রয়োজন। উত্তাপের সৃষ্টি হয় কোথা থেকে? উত্তাপ সৃষ্টি হয় আল্লাহর যিক্‌র থেকে, উত্তাপ সৃষ্টি হয় দুআ, মুনাজাত ও আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল তথা নির্ভরতা থেকে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলতে গিয়ে কষ্ট স্বীকার করতে হয়, মুজাহাদা করতে হয়, তাহলে দিলের মাঝে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্য অবলম্বন এবং অল্পে তুষ্টির যে সব গল্প-কাহিনী আপনারা ইতিহাসে পড়েন এবং এসব হযরত—যাঁদের সম্পর্কে এসব কিস্‌সা সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরা কোন দায়ে পড়ে কিংবা মজবুর হয়ে এসব ইখতিয়ার করেন নি, এ ছিল তাঁদের দিলের আওয়াজ। আর মজবুর তাঁরা ছিলেন বটে, তবে সে মজবুরী তাদের দিলের নিকট অর্থাৎ তাঁদের ভেতর থেকেই যেন কেউ বলে দিতঃ না, না, এ হতে পারে না। আমরা সম্পদের গোলাম নই, আমরা শক্তি ও ক্ষমতার গোলাম নই।

এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বজায় থাকা প্রয়োজন। স্বীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর সঙ্গে তাদের ভেতর জীবন থাকবে, থাকবে জীবনের ক্রিয়া ও স্পন্দন, থাকবে উত্তাপও এবং কোন একটি জায়গা, কোন অবস্থান আল্লাহর এসব বান্দাহ্ থেকে যেন মুক্ত না হয়। তাঁদেরকে যেন কেউ এই অপবাদ দিতে না পারে যে, তারা বিকিয়ে গেছে। হাজারও অপবাদ দিক, অমুক ভুল করেছে, অমুকের বিদ্যা-বুদ্ধির ভেতর অমুক কমতি রয়েছে, তিনি অমুক জিনিষের কথা বলেননি (এসব বলে বলুক), কিন্তু এ যেন না বলতে পারে এবং এ যেন অপবাদ আরোপ না করতে পারে যে, সে বিকিয়ে গেছে। এটা অনুধাবন করুন যে, উম্মাহর হেফাজতের গূঢ় রহস্য এই যে, মানুষ একজন দুজন যাই হোকনা কেন, তিনি যেন সমস্ত সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে হন। যুসুফ (আ)-এর চরিত্র সম্পর্কে যখন মিসর-রাজ আযীয মিসরের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ ব্যাপারটা কি বলতো? শহরের চারিদিকে কানাঘুষা চলছে। তুমিই বল দেখি, যুসুফের স্বভাব-চরিত্র কেমন? আযীয পত্নী এর জবাবে বলেছিলঃ ما علمنا عليه من سوء "সত্য বলতে কি, তাঁর স্বভাব-চরিত্রে আমি কোন দুর্বলতা দেখতে পাইনি।" আজও আমাদের আযীয-পত্নীর সঙ্গে মুকাবিলা চলছে। আজ সম্পদ আযীয পত্নী যুলায়খার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যুলায়খার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে

শক্তি ও ক্ষমতা মদমত্ততা, যুলায়খা আজ পদমর্যাদা প্রীতি (আর এসবই আজ যুলায়খার মত প্রলুব্ধকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে)। আর মিসরের য়ুসুফ (আ) কে? দীন! হাঁ দীন তথা ধর্মই আজ মিসরের আধীয য়ুসুফ। তাকে এমন হতে হবে যেন তাকে কেউ খরীদ না করতে পারে এবং সবাই যেন তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, ما علمنا عليه من سوء "আমরা তাঁর স্বভাব কিংবা চরিত্রগত কোন দুর্বলতার কথা জানি না কিংবা এ জাতীয় কোন কথাও তাঁর সম্পর্কে শুনিনি।" যে কোন কোণ থেকেই যেন আওয়াজ ভেসে আসে—এ খাঁটি সোনা যার ইচ্ছা পরখ করে দেখুক। সত্যি বলতে কি, মুসলিম উম্মাহর যে মেযাজ আজও অবশিষ্ট রয়েছে তা এসব আল্লাহ্‌র বান্দা এবং হৃদয়বান মানুষের বদৌলতেই, যাঁদের জন্য এই উম্মাহ্ বাতাসে উড়ে যায়নি যেভাবে অন্য উম্মাহ্ শুকনো পাতা কিংবা খড়-কুটোর মত উড়ো গেছে, এ উম্মাহ্ পানির তোড়ে ভেসেও যায়নি, যেভাবে অন্যান্য উম্মাহ্ খড়-কুটো ও আবর্জনার মত ভেসে গেছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এই (মুসলিম) মিল্লাতের হেদায়েত এবং তার দীনের খতিয়ান নেবার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। দেখতে হবে নামাযের ক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে কি না। এটাও দেখতে হবে যে, মুসল্লীর সংখ্যা কমছে না বাড়ছে; মসজিদ খালি হচ্ছে না ভর্তি হচ্ছে? জুয়ার আড্ডা বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি মসজিদের সংখ্যা? মুসলমানদের মধ্যে নতুন কোন ব্যাধিতো বিস্তার লাভ করেনি? যেমন, মদ্য পান, জুয়া খেলা কিংবা কোন কু-অভ্যাস ও রোগ-ব্যাধির পরিমাণ তো বাড়েনি? এসব বিষয়ে চিন্তা করতে হবে, ভাবিত হতে হবে। অন্যায়, অনাচার ও দুর্নীতির বিস্তারে এবং ন্যায়, সুনীতি ও সদগুণাবলীর বিলুপ্তিতে দুঃখ পেতে হবে। এসব গুণই হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্‌র স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দায়িত্ব। তাবলীগী জামাতের একটি বিরাট কৃতিত্ব এই যে, তারা উম্মাহর বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে সাধারণ গণ-মানুষের দুয়ারে নিয়ে গেছেন। প্রথমে সাধারণ মানুষ বিশিষ্ট জনদের দরবারে নিয়ে আসতেন। তারা বিশিষ্ট জনদেরকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। আমি একথা বলছি না যে, এটাই একমাত্র পথ। কিন্তু একথা অবশ্যই বলব যে, জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা চাই। তাদের কাছে যাওয়া চাই। গলি গলি ও মহল্লায় মহল্লায় যেতে হবে। গিয়ে দেখতে হবে যে, দীনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে না কি কমছে; অবস্থার, উন্নতি হচ্ছে না কি অবনতি হচ্ছে! নতুন কি সৃষ্টি হল। মরহুম আকবর ইলাহাবাদী বলছেন:

نقشوں کو تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو
کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے

"ছবির উপর পরীক্ষা-নীরিক্ষা না চালিয়ে জীবন্ত মানুষের সঙ্গে মিশে দেখ, কি জিনিষ জীবিত হচ্ছে আর কি মরছে।"

ভদ্রমন্ডলী! এর চেয়ে বেশী বলার মত অবস্থায় এখন আমি নই, আর এর প্রয়োজনও নেই। আমি মনে করি, আসল কথা বলা হয়ে গেছে।[১] শেষে আমি বরকত লাভের উদ্দেশ্য প্রথমোল্লিখিত হাদীছটির আমি পুনরাবৃত্তি করছি।

قال رسول الله صلى الله عليه و اصحابه و سلم الا ان في الجسد مضغة
اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هي القلب

---

১. এখানে এসে বক্তা তাঁর বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়েন। এমনি সময় তাঁর কয়েকটি কথা মনে পড়ায় তিনি আবার উঠে দাঁড়ান এবং বলেন: তওহীদের আকীদা দৃঢ়মূলকরণ, শির্‌ক তথা অংশীবাদিতার জড়ে-মূলে উৎসাদন এবং আকীদার সংস্কার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কুরআন মজীদের চেয়ে বড় কোন ঔষধ এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী বস্তু আর নেই। উলামায়ে কেরামের উচিৎ, তারা যেন শহর ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে দরস-ই-কুরআনের প্রথা চালু করেন এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাফসীরে বিশেষভাবে তওহীদের আকীদা প্রতিষ্ঠা এবং শিরক প্রত্যাখ্যানে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। পাঞ্জাবে মাওলানা হুসায়ন আলী এবং শায়খুত্তাফসীর মাওলানা আহমদ আলী সাহেব লাহোরী এর মাধ্যমে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং হাযার নয়—লক্ষ লক্ষ মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তাদের আকীদার সংস্কার ও সংশোধন হয়েছে।

দীনের নবীসুলভ মেযাজ এবং তার হেফাজতের প্রয়োজনীয়তা

[১৯৮১ সনের ৩রা নভেম্বর রোজ সোমবার তারিখে জোহরের পূর্বে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে মারকাযে জামাআতে ইসলামী, কাশ্মীর-এ জামা'আতের রফীক, রুকন, শুভানুধ্যায়ী এবং শিক্ষিত সুধী সমাবেশে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।]

বা'দ হামদ ও সালাত—

জনাব কায়েম-ই-মোকাম আমীর-ই-জামা'আত, রুফাকা-ই-জামা'আত, দোস্ত সকল এবং সমাগত শ্রদ্ধেয় ভদ্রমহোদয়গণ !

এখানে দাওয়াত জানিয়ে অতঃপর মানপত্র পেশের মাধ্যমে আপনারা আমাকে যেভাবে সম্মানিত করেছেন, তজ্জন্য আমি সর্বাগ্রে আপনাদের শুকরিয়া জানাই। দু'আ করি, আমার প্রতি আপনারা যে সুধারণা ও আস্থা আপনাদের প্রদত্ত এই ভালবাসার ছোঁয়াচমন্ডিত মানপত্রে ব্যক্ত করেছেন আল্লাহ পাক যেন তা সত্যে পরিণত করেন। আমি এ ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় সচেতন যে, এ মুহূর্তে এমন একটি জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির অধিকারী জামা'আতকে সম্বোধন করছি যার সৃষ্টিই হয়েছিল চিন্তা-চেতনা ও অধ্যয়নের উপর। এ কোন 'আম মানুষের সাধারণ সমাবেশ নয়। সেজন্য আমার বক্তৃতায় যদি বক্তাসুলভ উপাদান না থাকে তাহলে আপনারা যেন অস্বাভাবিক মনে না করেন।

আপনারা আমার প্রতি যে ভালবাসা, সুধারণা ও গভীর আস্থা ব্যক্ত করেছেন তারও হক রয়েছে। আমার বিবেকী মন, আমরা সীমিত চিন্তা-চেতনা, পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতারও দাবী যে, আমি আপনাদের সামনে এমন কিছু পেশ করি খোদ আমার নিকটও যা প্রিয় এবং আমি যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মনে করি। হাদীছে বলা হয়েছে— لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه "তোমাদের কেউ ততক্ষণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের জন্য যা পসন্দ কর তা তোমার ভাই-এর জন্যও পসন্দ কর।" হাদীছের ভাষা তাই যা আমি বললাম, কিন্তু আমাদের উলামায়ে কিরাম নানা রকম আপত্তি ও উদ্বেগের হাত থেকে বাঁচার জন্য এর মর্ম বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, "তোমাদের ভেতর কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।" দায়িত্বশীল সুধী এবং জামা'আতের কর্মীদের নিকট আমার প্রত্যাশা, আমি যে সৌষ্ঠব এবং যে পরিমাপে কথা বলছি ঠিক সেই একই সৌষ্ঠব ও পরিমাপের সঙ্গে আপনারা তা গ্রহণ করবেন এবং অন্যদের নিকট তা পেঁৗছেও দেবেন।

১. জামা'আতের আমীর মওলভী সা'দুদ্দীন এসময় হজ্জে গিয়ে-ছিলেন। কারী সায়ফুদ্দীন ছিলেন তাঁর কায়েম-ই-মোকাম।

ভদ্রমহোদয়গণ !

যে জামা'আত এবং যে দল থেকে কোন শিক্ষা, দর্শন, দাওয়াত ও আন্দোলন গ্রহণ করা হয় সেই জামা'আত বা দলের মেযাজ সেই আন্দোলন, শিক্ষা, দাওয়াত কিংবা দর্শনে প্রবাহিত হয়। এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই আল্লাহর প্রকৃতিসম্মত বিধান। আপনি যে উস্তাদের নিকট পড়েন, যে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে লেখা-পড়া শেখেন— সে উস্তাদ কিংবা শিক্ষকের চিন্তাধারাই নয় শুধু, বরং কথা বলার ভঙ্গিটি, কতক সময় তাঁর চাল-চলন পর্যন্ত আপনার উপর ছাপ ফেলে, আপনি অজ্ঞাতসারেই তা অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন। আপনি যে দল কিংবা সম্প্রদায় অথবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সঙ্গে বেশীর ভাগ উঠা-বসা করেন, জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে তাঁর প্রভাব আপনার চিন্তাগত কাঠামোকে, আপনার অনুভূতি, আপনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে এবং আপনার মানস চেতনাকে প্রভাবিত করে। আর এটাই স্বাভাবিক। চিকিৎসা শাস্ত্রের কথাই ধরুন না কেন (তা সে প্রাচীনকালের কিংবা বর্তমান যুগের চিকিৎসা শাস্ত্রই হোক); আমি দেখেছি, একজন মেধাবী ছাত্র সেভাবেই ব্যবস্থা-পত্র (প্রেস-ক্রিপশণ) দেন, ঠিক সেই পন্থায়ই রোগ নিরূপণ করেন, সেই সব বিষয় বর্জনের এবং সেভাবেই সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দেন, বরং অনেক সময় এমনও দেখেছি যে, তারা হুবহু মূলের অনুকরণ করেন। কুশতী খেলা যারা শেখেন তারাও একইভাবে শেখেন তারা তাদের উস্তাদের চমকপ্রদ ক্রীড়া-কৌশল, দাও প্যাচ কষার নিয়মাবলী, আখড়ায় অবতরণ করার এবং প্রতিপক্ষকে এক হাত দেখে নেবার কায়দা-কানুন একই পন্থায় আত্মস্থ করে থাকেন।

আল্লামা ইকবাল তাঁর গযল ও কাব্য-চর্চা সম্পর্কে যা বলেছেন প্রকৃত সত্য তার চেয়েও বেশী বিস্তৃত— ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو এই যে দীন, দীন-ই-ইসলাম—যার অনুগ্রহে ও বদৌলতে আল্লাহ আমাদেরকে ও আপনাদেরকে সরফরায করেছেন, ধন্য করেছেন, তা আমরা বুদ্ধিজীবিদের কাছ থেকে পাইনি, বিজ্ঞ পন্ডিত কিংবা দার্শনিকদের থেকেও তা গ্রহণ করা হয়নি, রাজনীতিবিদদের কাছ থেকেও আমরা তা গ্রহণ করিনি, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা কোন বিজয়ী বীরের থেকে অথবা নির্ভেজাল মেধার অধিকারী লোকদের থেকেও এ দীন গ্রহণ করা হয়নি, এ দীন গৃহীত হয়েছে আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম থেকে। এ জন্য এ দীনের গ্রহণকারীদের মধ্যে, এ দীনের উপর যারা চলছে তাদের ভেতর, এই দীনের দাওয়াত প্রদানকারী এবং দীনের

চিন্তা ও ফিকর পেশকারীদের ভেতর আম্বিয়া-আলায়হিমুস সালামের মেযাজ জারী থাকা দরকার। আর এটাই সেই "দানিশগাহ" (বিদ্যালয় ও মান-মন্দির)-এর ছাত্রদের সর্বাপেক্ষা বড় তরক্কী, বিরাট সৌভাগ্য (ব্যাখ্যা ভুল না হলে) ও মি'রাজ যে, তারা নববী মেযাজ যত বেশী সম্ভব গ্রহণ করবে এবং এতে তারা তত কামিয়াব হবে, হবে সফল।

আমি এই সুযোগে আপনাদেরকে একটি ছোট গল্প-কাহিনী পরিবেশন করতে চাই যদ্দ্বারা আমার কথা সম্ভবত আপনারা ভালভাবে বুঝতে পারবেন। কথিত আছে যে, আওরঙ্গযেব আলমগীরের দরবারে একজন বহুরূপী আসত। সে বিভিন্ন রকম বেশ পাল্টে আসত। আওরঙ্গযেব ছিলেন বহুমুখী অভিজ্ঞতার অধিকারী বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সুবিশাল ও সুবিস্তৃত একটি দেশের ছিলেন তিনি শাসক। তিনি তাকে তৎক্ষণাত চিনে ফেলতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতেন, আমি জানি তুমি অমুক, তোমাকে আমি চিনে ফেলেছি। সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত। এরপর সে অন্য বেশ ধরে ধরে আসত। এরপরও বাদশাহ তাকে চিনে ফেলতেন এবং বলতেন, আমি জানি তুমি অমুক, তমুকের বেশ পাল্টে এসেছ। এভাবে বহুরূপীর সব কৌশলই মাঠে মারা গেল। শেষাবধি আর না পেরে সে কিছু দিনের জন্য নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় জ্ঞান করল। অনেক দিন যাবত সে সম্রাটের সামনে আসা থেকে বিরত থাকল। বছর দু'বছর পর শহরে লোকের মুখোমুখি খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, কোন একজন বিখ্যাত বুযুর্গের আগমন ঘটেছে এবং তিনি অমুক পাহাড়ের চূড়ায় নির্জন সাধনারত। বর্তমানে তিনি চিল্লায় আছেন। খুব কষ্টে-সৃষ্টে লোকে তাঁর সাক্ষাত পায়। সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যার সালাম কিংবা নযরানা তিনি কবুল করেন এবং যাকে তিনি সাক্ষাত দান করেন। তিনি একেবারে একাগ্র মনে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত এবং দুনিয়ার সংস্রবমুক্ত।

সম্রাট ছিলেন হযরত মুজাদ্দিদে আলফে-ছানী (রা)-র চিন্তানুকারী এবং সুন্নাহর কঠোর অনুসারী। অত সহজেই তিনি কারোর প্রতি ভক্তি গদগদ চিত্ত হবার মত লোক ছিলেন না। তার প্রতি তিনি সঙ্গত কারণেই আদৌ ভ্রূক্ষেপ করলেন না। দরবারের সদস্যবর্গ কয়েকবার আরয করেন—জাঁহাপনার সেখানে তশরীফ নেবার জন্য এবং উক্ত বুযুর্গের যিয়ারত লাভ করে দু'আ নেবার জন্যে। সম্রাট ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যান। দু'চারবার অনুরুদ্ধ হবার পর একবার সম্রাট বললেন, ঠিক আছে ভাই, চলো গিয়ে দেখি। আর গিয়ে দেখতেই বা দোষ কি! উক্ত বুযুর্গ যদি আল্লাহর কোন মুখলিস বান্দা হন এবং তিনি যদি নির্জন সাধনা-মগ্ন থাকেন তাহলে তার যিয়ারত লাভে উপকারই হবে। সম্রাট গেলেন, অত্যন্ত আদবের সঙ্গে বসলেন এবং নযরানা ও দু'আর দরখাস্ত করলেন। কিন্তু দরবেশ এ নযরানা গ্রহণ করতে তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। সম্রাট এরপর বিদায় নিতে উদ্যত হতেই দরবেশ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সম্রাটকে কুর্নিশ করলেন। অতঃপর সালাম পেশের পর দরবেশ বললেন: জাঁহাপনা! এবার আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। আমি সেই বহুরূপী। কয়েকবার আপনার দরবারে গিয়েছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই আমার সকল জারিজুরী সম্রাটের সামনে ফাঁস হয়ে গেছে। সম্রাট স্বীকার করলেন এবং বললেন, তোমার কথা ঠিক বটে, তবে এবারে তোমায় আমি চিনতে পারিনি। কিন্তু বলতো দেখি, আমি যখন তোমাকে এত বড় বিরাট অংকের নযরানা পেশ করলাম—তুমি তা ফিরিয়ে দিলে কিভাবে? এত যে জারিজুরী তুমি দেখাও তাতো সব এরই জন্যে। তাহলে রহস্যটা কি? সে বলল, জাঁহাপনা! আমি যাঁদের বেশ ধরেছিলাম—এটা তাঁদের চরিত্র ও আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমি যখন তাঁদের বেশ ধরলাম এবং তাঁদের ভূমিকার অভিনয় করতে শুরু করলাম, তখন আমার শরম লাগতে লাগল যে আমি যাঁদের ভূমিকায় অবতরণ করেছি তাদের রীতি নয় কোন বাদশাহ কিংবা সম্রাটের দান গ্রহণ করা। আর এজন্যই আমি তা গ্রহণ করিনি। এঘটনা মন-মস্তিষ্কে আঘাত দেয় যে, একজন বহুরূপী যেখানে একথা বলতে পারে সেখানে চিন্তাশীল ও বিবেচক মানুষের পক্ষে—যারা লোকদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত জানিয়ে থাকেন তারা যদি আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের দাওয়াত কবুল করে তার মেযাজ কবুল না করেন তাহলে নিতান্ত এ পরিতাপের বিষয়। আমি এ কাহিনী নেহাৎ গল্পচ্ছলে বলিনি, একটি বাস্তব ও প্রকৃত সত্য একটু সহজবোধ্য উপায়ে মনের পর্দায় গেঁথে দেবার জন্য শুনিয়েছি।

আমরা দীনের দা'ঈ হই আর মুবাল্লিগ হই অথবা ইসলামের মুখপাত্র হই কিংবা ব্যাখ্যাতা—আমাদের একথা সম্মুখে রাখা দরকার যে, আমরা এ দীন ও দাওয়াত আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম থেকে গ্রহণ করেছি। আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম যদি এ দাওয়াত নিয়ে না আসতেন তাহলে আমরা এর পরশ পেতাম না। কুরআন শরীফে এসেছে যে, জান্নাতীদেরকে যখন পরকালে পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং তারা যখন বেহেশতে গিয়ে পৌঁছুবে তখন তারা বলবে—

وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا

"শোকর ও হামদ সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এখানে এনে পেঁাছেছেন, আর আল্লাহ যদি আমাদেরকে এখান অবধি না পেঁাছে দিতেন তাহলে আমরা এখানে পেঁাছুতে পারতাম না।" এখানে হেদায়েত শব্দের অর্থ পেঁাছান। এরপর আমি এক বিরাট সত্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।

আমরা যে এখান পর্যন্ত পেঁাছিয়েছি, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পথ ধরে নয়, অভিজ্ঞতার পথ ধরে নয়, আশরাকিয়াত, আত্মহনন, কঠোর রিয়াযত ও মুজাহাদার পথ ধরে নয়, বিজ্ঞান ও দর্শনের পথ ধরেও আমরা এ অবধি পেঁাছায়নি। প্রথমেতো তারা সংক্ষিপ্তাকারে বলেছে: وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله — "আমরা এখানে পেঁাছুতে পারতাম না যদি না আল্লাহ আমাদেরকে এখানে পেঁাছে দিতেন।" কিন্তু আল্লাহর পেঁাছানোর একটা পন্হা থাকে, তরীকা থাকে, থাকে একটা মাধ্যম। তার মাধ্যম কি? لقد جاءت رسل ربنا بالحق — "আমাদের প্রভু ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল এসেছেন সত্য নিয়ে।" মোদ্দা কথা এই যে, আল্লাহর দূত তথা রাসূল যদি সত্য নিয়ে না আসতেন তাহলে আমরা অন্ধকারে হাতড়ে মরতাম। দরজায় দরজায় ঠোকর খেয়ে ফিরতাম। আজ বেহেশতে না হয়ে আমাদের স্থান হত অন্য কোন খানে।

যাই হোক, আমাদের এ কথা ভোলা উচিত হবে না, যে জিনিষ আমাদেরকে এর যোগ্য বানিয়েছে তা বিজ্ঞ পন্ডিত, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ লোকদের থেকে লব্ধ কোন জিনিষ নয়, এ পয়গম্বরদের কাছ থেকে পাওয়া, আর এর কোন মাধ্যম নবুওত, রিসালত এবং এর বাহক আম্বিয়া-ই-কিরাম ভিন্ন অন্য কেউ হতে পারেন না। আমরা তা কবুল করেছি বলেইনা আল্লাহর সৃষ্ট এসব নে'মাত ও সৌভাগ্য লাভে ধন্য ও গৌরবান্বিত হবার যোগ্য হয়েছি এবং অন্যদের পর্যন্তও তা পেঁাছে দিয়েছি।

এখন আমাদের দেখতে হবে যে, নবুওতের মেযাজ কি? নবুওতের জন্য কোন বস্তু আন্দোলক হয়ে থাকে? নবীর চিন্তা-ভাবনা আন্দাজ কি হয়? এজন্য আপনাদের সামনে আমি তিনটি জিনিষ এ মুহূর্তে পেশ করছি।

প্রথম কথা এই যে, নবীর দাওয়াত, চেষ্টা-সাধনা এবং তাঁর বাণী ও কর্মের আন্দোলক হয় রিযা-ই-ইলাহী তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রেরণা। এ ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোন জিনিষ থাকে না, তাও থাকেনা যে,

১. সূরা আ'রাফ ৪৩ আয়াত;

তাঁর দাওয়াত ও চেষ্টা-সাধনার ফলে কি মিলল। এই প্রেরণা এমন এক নাঙ্গা তলোয়ার যা প্রতিটি জিনিষই কেটে দু'ভাগ করে দেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া তাঁদের আর কিছু কাম্য থাকেনা। আমার মালিক (আল্লাহ) আমার উপর সন্তুষ্ট, ব্যস! আর কিছুর দরকার নেই. সবই পেয়ে গেছি আমি। তায়েফ-এ যে দু'আ ও মুনাজাত উচ্চারিত হয়েছিল তার প্রাণ-বস্তুর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন এবং তায়েফের দৃশ্য আপনি সামনে রাখুন। সে দৃশ্য কি ছিল? হুযুর (সা) বড় আশা নিয়ে বিশ্বাসে বুক বেঁধে তায়েফ গমন করছেন। তায়েফের এ সফর সহজ ছিল না। দুরূহ ও দুর্গম রাস্তা, পাহাড়ের উচ্চতা এবং খচ্চরের সওয়ারী, আর একজন মাত্র সফর-সঙ্গী (যায়েদ ইবনে হারিছা)। তিনি সেখানে গিয়ে পেঁাছুলেন। তারপর কি হ'ল? সেখানকার সর্দার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আওয়ারা কিসিমের লোক লেলিয়ে দিল। তারা হযরতের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করল এবং এত পাথর বর্ষণ করেছিল যে, ঝরা রক্ত জমাট বাঁধার কারণে জুতো মোবারক খোলা যাচ্ছিলনা তাঁর কদম মোবারক থেকে। কদম মোবারক রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। সে সময় হযরতের পায়ে এত আঘাত লাগে নি যতটা লেগেছিল তাঁর হৃদয় মানসে। কি প্রত্যাশা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, আর কি হল! এখানে তো কেউ কথাই শুনতে চায় না। এ অবস্থায় তিনি নিম্নোক্ত দু'আ করেছিলেন। এ থেকে আপনারা জানতে পারবেন আল্লাহর রেযামন্দী ও সন্তুষ্টির মূল্য কত। তিনি বললেন: اللهم اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس - رب المستضعفين الى من تكلنى الى بعيد يتجهمنى او الى عدو ملكته امرى আমি এর তরজমা শুনিয়ে দিচ্ছি। "পরওয়ারদিগারে আলম! আমি আমার দুর্বলতা সম্পর্কে তোমাকে ফরিয়াদ জানাই, আমার অসহায়ত্ব ও নিঃসম্বলতা তোমার দরবারে পেশ করি; লোকের চক্ষে আমার অসম্মান, অসহায়ত্ব ও আশ্রয়হীনতা সম্পর্কে আমি তোমাকেই অভিযোগ পেশ করি। ওহে দুর্বলের প্রভু! তুমি আমাকে কার নিকট সোপর্দ করছ? এমন অপরিচিতের হাতে কি আমাকে তুলে দিতে চাও যে আমার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করে অথবা এমন কোন দুশমনের হাতে যার হাতে তুমি আমার সকল নিয়ন্ত্রণ ভার তুলে দিয়েছ?"

এখন দেখুন, এখানে নবীর মেযাজ ও প্রকৃতি স্বীয় পরিপূর্ণ শানশওকতের সঙ্গে দেদীপ্যমান হচ্ছে। উপরে যে শব্দগুলো উদ্ধৃত করা হল তারপরই বলা হচ্ছে ان لم يكن بك على غضب فلا ابالى غير ان عافيتك وهى اوسع لى "আর তুমি যদি আমার প্রতি নারায না হও তাহলে আমি

কোন কিছুরই আর পরওয়া করিনা। অবশ্য এতটুকু আমি অবশ্যই নিবেদন করব, যেহেতু আমি একজন মানুষ তো বটে যে, আমি তোমার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।" তো প্রথম যে জিনিষ আল্লাহর একজন নবীর মেযাজের ভিত্তি হয় তা হ'ল রিযা-ই-ইলাহী তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাঁরা পয়গাম পেঁাছিয়ে থাকেন (আর এটাই তাঁদের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত)। তাঁরা যখন জেনে যান আমরা আল্লাহর পয়গাম মানব সমাজের নিকট পেঁাছে দিয়েছি এবং আমাদের প্রভু প্রতিপালক আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন তখন তাঁরা ফলাফল ও পরিণামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে যান।

এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হযরত নূহ আলায়হিস সালামের ঘটনা। لبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما হযরত নূহ (আ) পঞ্চাশ কম হাযার বছর ধরে তাঁর কওমকে দীনের পথে, ধর্মের পথে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিভাবে তিনি দাওয়াত দেন? দাওয়াত দিতে গিয়ে দিন রাত তিনি একাকার করে ফেলেন। সূরা নূহ-এর সেই আয়াত পড়ুন:

قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا ۰ ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا —

(নূহ) বললেন: প্রভু পরওয়ারদিগারে আলম, আমি আমার কওমকে রাত্রিকালে দাওয়াত জানিয়েছি, জানিয়েছি দিনের বেলায়; এরপর প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, দাওয়াত দিয়েছি প্রচ্ছন্নভাবে গোপনীয়তার সঙ্গে।

সূরা নূহ, ৫ ও ৯ আয়াত;

এত সব কিছু করার পরও রেজাল্ট কি দাঁড়াল?

মাত্র অল্প কয়েকজন তাঁর হাতে ঈমান আনল (যাদেরকে হাতের আঙুলে গোনা যায়)। কিন্তু এর জন্য তাঁর চিত্ত বিমর্ষ নয়, কোন অভিযোগও নেই তাঁর। আমার যে কাজ ছিল আমি তা করেছি, আমি আমার প্রভুকে খুশী করেছি। সামনের কাজ! সে তো আল্লাহর।

তাহলে পয়লা কথা দাঁড়াল এই যে, দীনের প্রতিটি কর্মের পেছনে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া চাই আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহর এই সন্তুষ্টির বিনিময়ে যদি দুনিয়ার তাবৎ সাম্রাজ্য আমার হাত ছাড়া হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে, আসলে সাম্রাজ্য হাত ছাড়া হয়নি, বরং হস্তগত হয়েছে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে যদি সপ্ত মহাদেশের রাজত্বও মিলে যায় তাহলে বুঝতে হবে আসলে সপ্ত মহাদেশের রাজত্ব আমরা পাইনি, বরং তা খুইয়েছি

এজন্য আমি হযরত হুসায়ন (রা)-এর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানকে এক বিরাট গৌরবজনক অবদান হিসাবেই মনে করি। একে আমি একেবারেই ব্যর্থ মনে করিনা। তিনি একটি নজীর কায়েম করে গেছেন যে, অন্যায় ও ভুলের বিরুদ্ধে (তা তার উপর এর লেবেল লাগানো হোক কিংবা নাই হোক) যদি কেউ সংগ্রাম করে, চেষ্টা ও সাধনা চালায় তাহলে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হবে। যদি হযরত হুসায়ন (রা)-এর এই গৌরবময় কৃতিত্বের অস্তিত্ব না থাকত তাহলে পরবর্তীকালে অনেক বেশী অসুবিধা দেখা দিত। দেখা যাচ্ছে, কোথাও খোলাখুলিভাবে ও প্রকাশ্যে দীন পয়মাল করা হচ্ছে, ইসলামকে জবাই করা হচ্ছে, ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা করা হচ্ছে অথবা ধর্মের বিকৃতি সাধন করা হচ্ছে, কিন্তু তথাপিও তার বিরুদ্ধে কোন সরব প্রতিবাদ উঠানো যেতনা। যুক্তি দেখান হত যে, ইসলামের সোনালী যুগে এর কোন নজীর নেই।

পার্থক্য তো বিরাট, ইতিহাসেরও বিরাট ব্যবধান আর ব্যক্তিত্বেরও বিরাট ফরক। কিন্তু একই ব্যাপার বালাকোটের শহীদ হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ (র)-এর ক্ষেত্রেও যে, আজ পৃথিবীর কোন একটি ক্ষুদ্র অংশেও তাঁদের কিংবা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত জামা'আতের হুকুমত কিংবা শাসন ক্ষমতা নেই। আল্লাহর শোকর এবং এজন্য আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। আমারও তাঁর খান্দানের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে (বর্তমান গ্রন্থের লেখক সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী শহীদ-ই-বালাকোট হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ-এর বংশধর)। আল্লাহর প্রশংসা যে, তাঁর নাম কিংবা খ্যাতি সম্বল করে আমরা কোন ফায়দা লুটিনি। আমাদের পরিবারের লোকেরা চাকুরী করে, কাজ করে, পরিশ্রমের কাজ। সাধারণ মুসলমানদের মতই থাকে। গদ্দীনশীন হবার কোন প্রশ্ন নেই, তেমনি প্রশ্ন নেই দরগার খাদেম কিংবা সেবায়েতগিরী নিয়ে। এমনও নয় যে, তাঁরা কোন সাম্রাজ্য কায়েম করে গেছেন, আর আমরা খান্দানী সূত্রে তার থেকে ফায়দা লুটছি। এসব সত্ত্বেও আমরা খুশী ও তৃপ্ত যে, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন এবং আল্লাহর সামনে মস্তক তাঁদের উন্নত।

سودا قمار عشق میں خسرو سے کوہکن
بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا

প্রেমের জুয়ায় পাথর চূর্ণকারী মেতেছে খসরুর সাথে
বাজী জিততে না পারলেও মাথা তো পেরেছে দিতে।

আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সামনে প্রশ্ন থাকে কেবল একটাই আর তা হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রশ্ন, রেযামন্দীর প্রশ্ন; প্রতিটি বিষয়েই তাঁরা ভাবেন, এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট কিনা? উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া কিংবা দন্ডমুন্ডের মালিক অথবা রাজসিংহাসন লাভ করা, এসবই আল্লাহর ইনাম, এগুলো তার নিজস্ব সময়ে এবং যথাযথ শর্ত সহকারে মিলে থাকে। এর ভেতর কোনটিই তাঁদের কাম্য কিংবা লক্ষ্য নয়। অনন্তর আপনিই দেখুন যে, কুরআন মজীদে এক স্থানে আছে যে,

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ط

"এই পারলৌকিক আবাস আমরা কেবল তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট করে রাখব যারা দুনিয়ার বুকে (গর্বে) উন্নত মস্তকের অধিকারী হতে চায়না, চায় না ফাসাদ সৃষ্টি করতে। আর শুভ পরিণতি একমাত্র মুত্তাকীদের জন্যই।" —সূরা কাসাস, ৮৩ আয়াত।

কিন্তু আল্লাহ অন্যত্রই আবার বলছেন ঃ

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ○

"তোমরা হতবল হয়োনা, তোমরা চিন্তিত হয়ো না, পরিণামে তোমরাই উন্নত হবে, এই শর্তে যে তোমরা মু'মিন হবে।"—সূরা আল-ইমরান, ১৩৯। উল্লিখিত আয়াত দু'টোর মধ্যে এখন কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে? এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, তোমরা উন্নতি ও বুলন্দী (علو) চাইবে না, আমি তোমাদেরকে বুলন্দী দেব, উন্নত করব। অনন্তর আঁ-হযরত (সা), সাহাবাই-কিরাম কেউই বুলন্দী চান নি এবং বিনয়, ত্যাগ ও উৎসর্গের মনোভাব নিয়ে কাজ করেছেন। আল্লাহ পাকের যতটা মঞ্জুর ছিল তাঁদেরকে ততটাই বুলন্দী দান করেছেন। তো প্রথম কথা হ'ল এইযে, কাম্য হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে গিয়ে যদি আমাদেরকে সারা দুনিয়ার কল্যাণ ও স্বার্থ-চিন্তা থেকে হাত ধুতে হয়, জাগতিক ও বৈষয়িক লাভ বর্জন করতে

হয় তাহলে সেইটেই কামিয়াবী ও সাফল্য। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গোটা পৃথিবীর রাজত্বও যদি মিলে যায় তাহলে সেটাই ব্যর্থতা। এটাই নবী প্রকৃতি, নববী মেযাজ যা কোন লৌকিকতা কিংবা পরিকল্পনা ছাড়াই পয়গাম্বর ও তাঁর সত্যিকার অনুসারীদের ভেতর সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআন শরীফে এই বিষয়টাকেই এভাবে বলা হয়েছে,

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

"যেদিন না সম্পদ কোন ফায়দা দেবে, না সন্তান-সন্তুতিই কোন উপকার দর্শাবে; তবে হ্যাঁ, যদি কেউ আল্লাহর সমীপে পবিত্র ও সুস্থ মন-মানস নিয়ে হাযির হতে পারে (তবে সে পরিত্রাণ পাবে)।"[১] তার ভেতর আল্লাহ ভিন্ন আর কোন আন্দোলন কিংবা প্রেরণাদাতা, অন্য কোন শক্তি, অন্য অভিপ্রায় কিংবা অভিলাষ যেন না থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ) কে নিম্নোক্ত শব্দ সমষ্টির মাধ্যমে প্রশংসা করা হয়েছে ঃ

اذ جاء ربه بقلب سليم ○

"আর স্মরণ কর, যখন সে (ইবরাহীম) তাঁর প্রভু সমীপে নির্দোষ ও সুস্থ মন নিয়ে হাযির হ'ল।"[২] মন-মানসকে সুস্থ ও নির্দোষ মন-মানস বানাবার জন্য সর্বদা চেষ্টা চালাতে হবে। অব্যাহত রাখতে হবে সে প্রয়াস। নিজের মন-মানসকে সব সময় আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-সমিক্ষার সম্মুখীন রাখতে হবে। দেখতে হবে, তার ভেতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, বস্তুগত স্বার্থ, বুলন্দী ও সমুন্নতির কোন প্রেরণা কাজ করছে না তো। ইকবাল ঠিকই বলেছেন ঃ

براهیمی نظر پیدا ذرا مشکل سے ہوتی ہے
ہوس سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہیں تصویریں

আঁ-হযরত (সা) বলেছেন ঃ ان الشيطان يجرى من المؤمن مجرى الدم "শয়তান মু'মিনের দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় এভাবে চলাচল করে যেভাবে চলাচল করে রক্ত।" হযরত আমীর-ই-কবীর সায়্যিদ 'আলী হামদানী (র)-এর দাওয়াত এই সুস্থ ও নিষ্কলুষ মন-মানসিকতার দাওয়াত ছিল ছিল, তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) ও ইহসান-এর সারাংশ এবং

---

১. আশ-শু'আরা, ৮৯-৯০ আয়াত;
২. সূরা আস-সাফফাত, ৮৪ আয়াত,

আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা—যারা মানুষের মন-মানস ও আত্মার চিকিৎসা করতেন—তাঁদের কাজও ছিল এটাই যে, সুস্থ মন-মানসিকতা সৃষ্টি হোক। তাঁরা চাইতেন যে, তাঁদের নিকট যারা উঠাবসা করেন তারা এই সুস্থ ও নির্দোষ মন-মানসিকতার অধিকারী হোক। তাদের ভেতর থেকে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, সম্পদ প্রীতি, পদমর্যাদার প্রতি লোভ এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি সেই প্রেম ও আকর্ষণ (যা আল্লাহর নির্দেশিত বিধি-বিধান পালনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে) বেরিয়ে যাক।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, আম্বিয়া-ই-কিরাম (এবং আম্বিয়া-ই-কিরাম-এর প্রতিনিধিবৃন্দ) দীনের তা'লীম এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম তথা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা কোন-রূপ রদবদলের আশ্রয় নেন না। তাঁরা যেভাবে এগুলো আল্লাহর তরফ থেকে পেয়ে থাকেন ঠিক তেমনি বিন্দুমাত্র কমবেশী না করে তাঁরা সেগুলো আল্লাহর বান্দাদেরকে পেঁাছিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁরা ذهنی (বুদ্ধিবৃত্তিক) উৎকোচ গ্রহণও করেন না. উৎকোচ দেনও না কাউকে। কেউ মানুক আর নাই মানুক, কেউ তাঁদের কাছে আসুক আর নাই আসুক, তাঁরা তাঁদের কথা ঠিক সেই আন্দাজেই বলে থাকেন যেই আন্দাজ ও পদ্ধতিতে আল্লাহপাক তাঁদেরকে সেই কথা শিখিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন। যেমন ধরুন, এমন হ'ল যে, কাফিররা এসে মুসলমানদের নিকট প্রস্তাব পেশ করল যে, এস আমরা নিম্নোক্ত উপায়ে আমাদের পারস্পরিক আদর্শ-গত বিরোধগুলো মিটিয়ে ফেলি। তোমরা কিছু দিন আমাদের মূর্তি-গুলোকে প্রণতি জানাবে, পূজো করবে, আর আমরাও কিছু দিন তোমা-দের নির্ধারিত ইবাদতগুলো পালন করব। আল্লাহর পয়গম্বর জওয়াব দেন ঃ কখখনো নয়।

لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ○

"না আমি তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীগুলোর পূজো করব, আর না তোমরাই আমার প্রতিপালক প্রভুর ইবাদতকারী।" সূরা কাফিরূন ২-৩; তায়েফের ছকীফ গোত্র চেয়েছিল যে, কুরায়শদের "হুবল" মূর্তির সমপর্যায়ের বড় মূর্তি "লাত"কে যেন না ভাঙ্গা হয় এবং কিছুকাল যেন তাদেরকে এটির পূজো চালিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রথমে তারা এজন্য একবছর সময় চেয়েছিল। রাসূল (সা)-এর অসম্মতি দৃষ্টে অতঃপর ছ'মাস, কিন্তু আঁ-হযরত (সা) তারপরও রাজী না হওয়ায় তারা অন্তত এক মাস সময় দেবার আবেদন জানায়। শেষাবধি একদিনের

আবেদনও প্রত্যাখ্যাত হয়। এরপর হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) কে পাঠানো হয়, তিনি গিয়ে উক্ত মূর্তি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেন। তারা আবার বলল যে, আমরা ইসলাম কবুল করছি, কিন্তু আমাদের নামায মাফ করে দিতে হবে। তিনি বললেন, لا خير في دين لا ركوع فيه এমন দীনে আছেই বা কি যে, দীনের ভেতর রুকু সিজদা নেই।

আরও একটি বিষয় হ'ল এই যে, তারা কোন প্রকার আপোষ কিংবা সমঝোতা করতেন না। তাঁরা সেই শব্দ সেই ভাষাই ব্যবহার করতেন যা তাঁদের পয়গাম ও রিসালত কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। পারলৌকিক জীবনের দিকে পরিষ্কার ভাষায় দাওয়াত দেন, বেহেশত ও দোযখের কথা তুলে ধরেন এবং তাদের প্রতি ঈমান বিল-গায়ব তথা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনের দাবী জানান। তাঁদের যুগেও বিভিন্ন দর্শনের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দল ও গ্রুপের নির্দিষ্ট পরিভাষা থাকে। আম্বিয়া-ই কিরাম সেসব সম্পর্কে অনবহিত থাকেন না। তাঁদের যুগেরও প্রচলিত ছাঁচ থাকে, প্রচলিত সে ছাঁচ তাঁরা ব্যবহার করেন না। সাফ সাফ কথা বলেনঃ আল্লাহর উপর ঈমান আন, তাঁর গুণাবলী, তাঁর কর্মসমূহ, ফেরেশতা-কুল, তকদীর, হাশর-নশর, মৃত্যু পরবর্তী জীবন—এসবের উপর ঈমান আন। যদি ঈমান আন, তাহলে জান্নাত মিলবে তোমাদের। একবারও বলেন না—তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে, হুকুমত পাবে। সব সময় এটাই বলতেন. তোমরা জান্নাত পাবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি মিলবে, আল্লাহ তোমাদের উপর রাযী থাকবেন, সন্তুষ্ট হবেন। কুরআন ও হাদী-সের কোথাও আমি পাই না যে, দীনের দাওয়াত কবুল করলে দুনিয়ার বুকে সমুন্নতি লাভ করবে, ক্ষমতার মসনদে সমাসীন হবে। যদি কোথাও হুকুমত শান্তি ও নিরাপত্তা এবং হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তার ধরন এই ঃ

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا - يعبدونني لا يشركون بي شيئا ط ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفسقون -

النور—৫৫।

"তোমাদের ভেতর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবেনা; অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো ফাসিক।" সূরা নূর, ৫৫ আয়াত;

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة - الحج ٤١

"যাদেরকে আমি পৃথিবীর বুকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলে তারা তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে।" সূরা হজ্জ, ৪১ আয়াত;

অর্থাৎ এখানে ইকামাতুস-সালাত ও যাকাত আদায় আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, উপায় কিংবা মাধ্যম নয়, এ পথ দিয়েই হুকুমতে ইলাহিয়া পর্যন্ত পৌছুতে হবে; বরং হুকুমতে ইলাহিয়ার মাধ্যমে আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। তারপরই কেবল সে সবের (সালাত ও যাকাত ব্যবস্থার) প্রচলন করতে হবে। মোটকথা এই যে, আম্বিয়া-ই-কিরাম দীনের মকসূদ (ঈপ্সিত বস্তু), সূচনা, হাকীকত ও আকীদাগুলির ব্যাপারে অত্যন্ত ঈর্ষাকাতরই নন, বরং সীমাতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণও হয়ে থাকেন এবং এক্ষেত্রে তারা এতটুকু বিকৃতি কিংবা পরিবর্তন সইতে পারেন না।

মদীনাবাসীরা যখন বায়'আতে আকাবায় জিজ্ঞাসা করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমরা আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াব, আপনাকে পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা দেব; বিনিময়ে আমরা কি পাব? রাসূল (সা)-এর জন্য এ উত্তর দেওয়া খুবই সহজ ছিল যে, আরে ভাই। আমরা আসব, তোমরা আমার পাশে এসে দাঁড়াবে, পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। ব্যস! আমরা বিরাট এক বাদশাহী গড়ে তুলব, আমাদের মিলিত প্রচেষ্টায় বিরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে। আজ তোমরা বিচ্ছিন্ন। তোমাদের মাঝে নেই একতা, নেই সংহতি। আমাদের কারণে সেই ঐক্য ও সংহতি ফিরে আসবে তোমাদের মাঝে। এখন তোমরা দুর্বল, যখন শক্তি ফিরে

আসবে। রাসূল (সা) এসব কিছুই বলেন নি। কেবল বলেছিলেন ঃ তোমরা আল্লাহর রেযামন্দী লাভ করবে।

এর আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

জাবালা বিন আয়হাম বিরাট একজন আরব দলপতি। সিরিয়ার অন্তর্গত গাসসানী রাজ্যের নরপতি। সাবেক বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্য হায়দারাবাদ প্রভৃতির ন্যায় এ রাজ্য। মুসলমান হ'ল জাবালা। সেই সঙ্গে মুসলমান হল তাঁর হাজার হাজার প্রজা ও সঙ্গী অনুচরবৃন্দ। একবার মক্কায় আগমন ঘটল তার। এসে সে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে গেল। সে সময় এক আরব বেদুঈন তাওয়াফ করছিল। তাওয়াফ করবার সময় জাবালার শাহী পোশাক চাদর ঝুলছিল এবং মাটি দিয়ে গড়িয়ে চলছিল। দৈবক্রমে আরব বেদুঈনের পা গিয়ে পড়ে জাবালার চাদরের উপর। ফলে তার শরীর থেকে চাদর খসে পড়ে এবং দেহ তার নগ্ন হয়ে পড়ে। এতে ক্রোধান্বিত হয়ে সে বেদুঈনকে এত সজোরে থাপ্পড় মারে যে, তাতে বেদুঈনের নাকের ডগার হাড্ডি ভেঙে যায়। বেদুঈন পাল্টা আঘাত হানার সাহস সঞ্চয় করতে না পেরে আমীরুল-মু'মিনীন হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করল জাবালার বিরুদ্ধে। বিচারে তিনি জাবালাকে দোষী সাব্যস্ত করে জাবালা থেকে আঘাতের বদলা (কিসাস) নেবার নির্দেশ দিলেন বেদুঈনকে। লোকেরা জানাল যে, এতে সে অপমানিত বোধ করবে। এমন কি সে মুসলমান নাও থাকতে পারে। হযরত উমর ফারুক (রা) এর জবাবে বললেন ঃ কুছ পরোয়া নেই (আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে)। এতে জাবালা বলল ঃ আমি এমন ধর্মে থাকতে রাজী নই যেখানে আমার অসম্মান হয়। এই বলে সে চলে গেল। এতদসত্ত্বেও হযরত উমর (রা)-এর চেহারায় চিন্তা কিংবা উদ্বেগের এতটুকু ছাপ দেখা গেল না। কে গেল আর কে থাকল তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমরা আল্লাহর হুকুম নড়চড় করব না।

হযরত উসামা (রা) একবার রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সুপারিশ পেশ করল যে, অমুক সম্মানী গোত্রের জনৈকা মহিলা চুরি করেছে, তিনি যেন তার শাস্তি বিধান না করেন। রসূল (সা) বললেন ঃ

لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها -

আল্লাহ না করুন, যদি মুহাম্মদ কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে

অবশ্যই আমি তার হাত কাটতাম। তিনি এও বললেন ঃ আল্লাহর ঘোষিত শাস্তির ক্ষেত্রে তুমি সুপারিশ করতে এসেছ? এতটুকু বলতেই হযরত উসামা (রা) সমঝে গেলেন এবং আর কিছু বললেন না। অপরাধিনীর নির্ধারিত শাস্তির বিধান কার্যকর হ'ল।

এখানে আরও একটি বিষয় এই যে, আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম এভাবে দীনকে তার যথার্থ স্থানে পেঁৗছে দিতেন এবং সে সব পরিভাষা-ই প্রয়োগ করতেন যা পয়গাম্বরদের দাওয়াত ও আসমানী গ্রন্থগুলিতে এসেছে, বরং এ ক্ষেত্রে তারা শব্দের পর্যন্ত হেফাজত করতেন। তাঁরা দীনের এমন ব্যাখ্যা করতেন না যদ্দ্বারা ধারণা হয় যে, বহু লোকই তো লেখাপড়া জানা, মেধাবী ও প্রতিভাবান, এ ব্যাখ্যা শুনে ছুটে চলে আসবে। না, তাঁরা তা করতেন না; বরং তাঁরা যে জিনিস যেভাবে পেয়ে থাকেন সে জিনিস ঠিক সেভাবেই তাদের সামনে রেখে দেন, তবে অবশ্যই হিকমত তথা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে তাঁরা এ আয়াতের মর্মানুযায়ী আমল করেন ঃ

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"তোমার প্রভু প্রতিপালকের পথের দিকে লোকদেরকে আহবান জানাও হিকমত ও সর্বোত্তম উপদেশের সঙ্গে।" সূরা নাহল ঃ ১২৫ আয়াত;

কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁরা এ বিপদ ডেকে আনতেন না যে, মানুষের মেধা অন্য এক খাতে প্রবাহিত হোক। এরই নাম নববী মেযাজ, নবী প্রকৃতি, আর একমাত্র এ কারণেই আল্লাহুর ফযল ও করমের পর এই দীন অদ্যাবধি এজন্য নিরাপদ ও সংরক্ষিত রয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি যুগে উলামা-ই-রব্বানী এর হেফাজত করে চলেছেন। তাঁরা (উলামা-এ রাব্বানী) এর প্রাণসত্তারও হেফাজত করেছেন, এর বিভিন্ন ধাপ ও স্তরেরও হেফাজত করেছেন এভাবে যে, দীন ইসলামের ভেতর যেই হুকুম এবং যেই রুকন-এর যে মর্যাদা ও অবস্থান তা যেন বাকী থাকে। যেখানকার যে জিনিস তা যেন সেখানেই রাখা হয় ঃ ইবাদতের জায়গায় ইবাদত, ফরযের জায়গায় ফরয তথা অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের জায়গায় অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য, আরকান-আহকামের জায়গায় আরকান-আহকাম, ঈমানের জায়গায় ঈমান আর আখিরাতের জায়গায় আখিরাত। তাঁরা কখনই দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য পেতে দেননি। এরই ফলে আমরা মুসলমানেরা বেআমল, গোনাহ্গার এবং দুর্বল ঈমানের হলেও এই দীন (ইসলাম) নিরাপদ ও সুরক্ষিত। অদ্যাবধি এ দীন

বিকৃত হয় নি, হতে পারে নি। এর বিপরীতে আমরা কি দেখতে পাই? খৃস্টানদের কথাই ধরিনা কেন। গির্জার অধিপতি ও বাইবেলের ব্যাখ্যাতাগণ তাদের স্ব স্ব যুগে কতক আধুনিক মতবাদ ও দর্শন বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করেন। বাইবেলের ভেতর যেগুলো ঢোকান যায় নি, সেগুলো এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কিংবা টীকা-ভাষ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। ফল দাঁড়াল এই যে, মতবাদ ও দর্শনের পরিবর্তনের সঙ্গে বাইবেলের অস্তিত্বই নড়বড়ে, সন্দেহযুক্ত ও অবিশ্বস্ত হয়ে যায়। বাইবেলের ব্যাখ্যার তারা লিখল যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা। কেননা পৃথিবী চ্যাপ্টা না হয়ে যদি গোল হয় তাহলে কিয়ামতের দিন সবাই আল্লাহ্কে কিভাবে দেখবে? পরবর্তীকালে বাইবেলের এ ব্যাখ্যা ভুল প্রমাণিত হয় এবং পৃথিবী যে গোলাকার তা সবাই মেনে নেয়। এর প্রভাব গিয়ে পড়ল বাইবেলের ওপর, তার সত্যতার ওপর, এমন কি তা যে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত এবং আল্লাহর কালাম—এ বিশ্বাসের ওপরও তা প্রভাব ফেলল।

"শেষ কথা হ'ল পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস-এর সংরক্ষণ ও তার প্রচার-প্রসার। এটি হ'ল আম্বিয়া-ই-কিরামের দাওয়াতের বুনিয়াদী বিষয়। যে লোক আম্বিয়া-ই-কিরামের বাণী ও অবস্থাসমূহ নিয়ে অধ্যয়নের ভেতর জীবন অতিবাহিত করেন এবং তাঁদের বাণীর যথার্থ আনন্দ সুখ উপভোগ করেন—তারা পরিষ্কার অনুভব করেন, আখেরাত যেন নিত্যই তাদের চোখের সামনে সংঘটিত হচ্ছে এবং তার ছবি (নেয়ামত ও মুসীবত, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের বিস্তারিতসহ) তাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা সদা-সর্বদা জান্নাতের প্রতি প্রবল আগ্রহ এবং জাহান্নামের ব্যাপারে প্রচন্ড ভীতির মাঝে কাল কাটান। বিষয়টি তাদের জন্য একেবারে পর্যবেক্ষণ ও চাক্ষুষ ঘটনার মত যা তাদের বুদ্ধি-বিবেক, উপলব্ধি ও অনুভূতি এবং চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

"আখেরাতের উপর ঈমান এবং সেখানকার প্রাপ্তব্য চিরন্তন সৌভাগ্য ও অবিনশ্বর দুর্ভাগ্য এবং সে সমস্ত নেয়ামত (যা আল্লাহ পাক তদীয় নেক বান্দাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন) ও আযাব (যা নাফরমান কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে) সদা-সর্বদা চোখের সামনে থাকা—এই ছিল আম্বিয়া-ই-কিরামের দাওয়াত ও উপদেশের আসল প্রেরণাদায়ক শক্তি। এটাই তাদেরকে পেরেশান করতে থাকত, রাতের ঘুম কেড়ে নিত, জীবনে আরাম, শান্তি ও পবিত্র অনুভূতিকে নষ্ট করে দিত এবং কোন অবস্থাতেই তা তাদেরকে শান্তি ও স্থিরতার মাঝে থাকতে দিত না। চোখের সামনে বিরাজিত অন্যায় অনাচার ও পাপ এবং অবস্থার অবনতি ও পরিবেশের খারাপ দিকগুলোর চরম ও মারাত্মক রূপ অবলোকনের ক্ষেত্রেও

(যে সব দুঃখে তাঁরা কষ্ট অনুভব করতেন) তাঁদের দিল ও দিমাগের উপর সর্বাধিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী এবং তাদের জন্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অনুপ্রেরণাদানকারী শক্তি ছিল এই আখিরাতের চিন্তা আর তাঁরা একেই তাঁদের দাওয়াত ও তবলীগের আসল ভিত্তি এবং তাঁদের ভীতি ও চিত্ত-চাঞ্চল্যের মৌলিক কারণ বলে অভিহিত করতেন।"[১]

এরপর আমি আবার আগের কথাই বলতে চাই যে, এই যে দীন আমরা পেয়েছি তা বুদ্ধিজীবিদের কাছ থেকে পাইনি, লেখক কিংবা গ্রন্থকার থেকেও পাইনি, পাইনি আমরা চিন্তাবিদদের কাছ থেকে। রাজনীতিবিদদের থেকেও আমরা এ দীন পাইনি, বিজ্ঞ পন্ডিত এবং দার্শনিকদের থেকেও না। এ দীন আমরা পেয়েছি পয়গম্বরদের থেকে। এজন্য আমাদের প্রতিটি বিষয়েই দেখতে হবে যে, এই মুহূর্তে এবং এখানে যদি পয়গম্বর থাকতেন তাহলে তিনি কি বলতেন। যদি নবী হতেন তাহলে কি ভাষায় কথা বলতেন, কোন জিনিষের দাওয়াত দিতেন, তাঁর দাওয়াতে কোন বস্তুর পরিমাণ কি এবং কতটা থাকত। আশা করি, যারা সত্য-সন্ধানী, যারা দীনের সন্ধানী, কেবল তারা একেই মানদন্ড বানাবেন এবং সর্বদা এটিই সামনে রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا
صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝

(তারাই রাহমান ও রহীম আল্লাহর বান্দা) যাদেরকে তাদের প্রভু প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা বোঝান হ'লে বধির ও অন্ধ হয়ে যায় না (বরং বুঝতে চেষ্টা করে)। সূরা আল-ফুরকান;

আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আল্লাহ পাক আমাদের ও আপনাদের সবাইকে তওফীক দিন, তিনি আমাদেরকে দৃঢ়তা দান করুন। এবং যখন তাঁর সামনে আমরা হাযির হব তিনি যেন আমাদেরকে সফলকাম করেন। আমাদের সামনে যেন সেই আয়াত মুবারক থাকে যে আয়াত দ্বারা আমি এ মাহফিলের উদ্বোধন করেছিলাম।

---

১. এই অংশটুকু মওলানা নদভীর বক্তৃতায় এড়িয়ে গিয়েছিল। منصب نبوت اور اس کی بلند مقام حاملین নামক তাঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বক্তৃতার বিষয়বস্তু আরও ব্যাপকতা ও পূর্ণতা পেয়েছে।

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ
وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ
اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

সেদিন কতক মুখমন্ডল শুভ্র-সমুজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ হবে কৃষ্ণকায় মসীলিপ্ত; অতএব যাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণকায় মসীলিপ্ত, (তাদেরকে বলা হবে) 'ঈমান আনার পর তোমরা কি কাফির হয়ে গিয়েছিলে? এখন তোমাদের কুফরীর কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদন ভোগ কর।' আর যাদের মুখমন্ডল হবে শুভ্র সমুজ্জ্বল তারা আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে অবস্থান করবে, অবস্থান করবে সেখানে তারা চিরদিন। সূরা আল-ইমরান, ১০৬-৭ আয়াত;

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের সম্পর্কে তুমি বলেছ :

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝

আর যাদের মুখমন্ডল, হবে শুভ্র সমুজ্জ্বল, তাদের অবস্থান আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে এবং সেখানেই থাকবে তারা চিরদিন। সূরা আল-ইমরান : ১০৭ আয়াত;

ঈমান ও তার মূল্য

[৩১শে অক্টোবর জোহর নামায বাদ ঈদগাহ ময়দানে মসজিদে তিব্বতী মুহাজিরদের একটি সমাবেশে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়][1]

খুতবার পর !

فاستجاب لهم ربهم انى لا اضيع عمل عامل منكم من

ذكر او انثى ج بعضكم من بعض ج فالذين هاجروا

واخرجوا من ديارهم واوذوا فى سبيلى وقتلوا وقتلوا

لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنت تجرى من

تحتها الانهار ج ثوابا من عند الله ط والله عنده حسن

الثواب ٥

অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেনঃ আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ পুরুষ অথবা নারীর কর্ম বিফল করিনা; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি তাদের মন্দ কাজগুলি অবশ্যই দূরীভূত করব

১· এ সমাবেশের ইন্তেজাম করেন মওলভী ওয়ালিয়ুল্লাহ শামু নুদভী, মৌলভী ইসমাতুল্লাহ বাবা নদভী, হাজী মুহাম্মদ উছমানু বাট এবং তাদের বন্ধু-বান্ধব। শ্রীনগরে বিরাট সংখ্যক তিব্বতী মুহাজির বাস করেন। চীন কর্তৃক তিব্বত অধিকৃত হবার পর সেখানকার মুসলমানদের ঈমান-আমান মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হলে এসব মুহাজির দেশ ত্যাগ করে কাশ্মীরে আগমন করেন।

এবং অবশ্যই তাদের দাখিল করব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহর নিকট থেকে এটা পুরস্কার; আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহরই নিকট। সূরা আলে-ইমরান, ১৯৫ আয়াত;

প্রিয় ভায়েরা আমার !

অত্যন্ত খুশীর বিষয় যে, আমি আমার মুহাজির ভাইদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হবার সুযোগ পাচ্ছি। এ সাক্ষাত সমস্ত রাজনীতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উদ্দেশ্য থেকে একেবারেই মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে (সা)-এর মুহব্বত এবং ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত হবার কারণেই। আর এ ধরনের সুযোগ খুব কমই ভাগ্যে জোটে।

ভায়েরা আমার !

দেশ কেন দেশ হয় আর ফারসী ভাষার জনৈক কবিই বা কেন বলেনঃ

خاك وطن از ملك سليمان خوشتر

خار وطن از سنبل و ريحان خوشتر

সুলায়মানের রাজত্বের চেয়েও দেশের মাটি অনেক ভাল
স্বদেশের কাটা রায়হান ও ছুম্বুলের চেয়েও সুন্দরতর

এর কারণ এই যে, দেশ হ'ল প্রিয় ও পরিচিত বস্তু-সামগ্রীর মিলিত নাম। যে সব বস্তু মানুষের প্রিয় তার সব কিছুর একত্রে সমাবেশ ঘটে একটি দেশে। এখানে অতিবাহিত হয় তার শৈশব, অতিবাহিত হয় তার কৈশোর ও যৌবন। এখানেই তার জন্ম, এর অলি-গলিতেই হয় তার পদচারণা। এখানকার বাগ-বাগিচা ও গলি-খুপচীতে সে খেলে থাকে। এর প্রতিটি অণু-পরমাণু ও পত্র-পুষ্পের সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত সে। আর সে এসবকে ভালবাসে। এর মাটিতে ঘুমিয়ে থাকেন, সমাহিত হন তার পূর্বপুরুষ। স্বদেশ-স্বভূই-এর সঙ্গে বিদেশ-বিভুইঁয়ের এটাই পার্থক্য যে, স্বদেশে ভালবাসার উপকরণ ও প্রেম-প্রীতির কেন্দ্র বিরাট সংখ্যায় সমাবেশ ঘটে। এজন্য হযরত বেলাল (রা) যখন মক্কা মু'আজ্জমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করে গিয়েছিলেন সেখানে ছিল তার বন্ধু, মাহবুবে রাব্বুল আলামীন (হযরত মুহাম্মদ), আল্লাহ তাকে এত সম্মান দান করেছিলেন যে, তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)ও মসজিদে নববীর মুয়ায্যিন বানিয়ে দেন, সেই বেলালও কখনো কখনো জন্মভূমির কথা স্মরণ করে গেয়ে উঠতেনঃ

الا ليت شعري هل ابيتن ليلة — بواد و حولي اذخر و جليل

"হায়! আমার জীবনে কখনো এমন রাতও কি ফিরে আসবে যে, আমি এমন এক উপত্যকায় রাত কাটাব যার চতুষ্পার্শ্বে থাকবে ঘাস-পাতা।''

স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সময় মক্কা থেকে রওয়ানা হবার মুহূর্তে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে চোখ তুলে বলেছিলেনঃ আমি কখনোই তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না, কিন্তু এখানকার লোক আমায় এখানে থাকতে দিচ্ছেনা, বের করে দিচ্ছে আমাকে। তা ছাড়া এখানে স্বীয় দীন ও ধর্মমতের উপর টিকে থাকা মুশকিল।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহর বান্দাহ্‌রা দীনের খাতিরে, ধর্মের খাতিরে এমন প্রিয় যে স্বদেশভূমি তাকেও বিদায় সালাম জানিয়েছিলেন। অনেক লোক তাদের সারা জীবনের সঞ্চয়, তামাম জীবনের কামাই পুঁজি পরিত্যাগ করেছিলেন, বিদায় জানিয়েছিলেন প্রাণপ্রিয় সন্তান-সন্ততিকেও। হযরত আবূ সালমা (রা) যখন হিজরত করবার জন্য বের হলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন জীবন-সঙ্গিনী হযরত উম্ম সালমা (যিনি পরবর্তীকালে উম্মুল মু'মিনীন হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন)। উম্মু সালমা (রা)-এর কবীলা বনূ আল-মুগীরার লোকেরা হযরত আবু সালমা (রা)-এর উটের রশি টেনে ধরে বললঃ কোথায় চলেছ? তুমি তোমার ধর্ম বদলেছ ভাল কথা। কিন্তু আমাদের বংশের এ কন্যা-রত্নটিকে তুমি কিভাবে নিয়ে যেতে পার? না, সে তুমি পারবে না। হযরত আবু সালমা (রা) বললেনঃ আচ্ছা, আমি যদি তাকে রেখে যাই তাহলে তোমরা আমাকে যেতে দেবে ত? তারা তাদের সম্মতি প্রকাশ করল। আবূ সালমা (রা) স্ত্রীকে সালাম জানিয়ে এবং স্ত্রী ও সন্তানকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করে নিজে রওয়ানা হলেন। যাবার সময় বললেনঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করে গেলাম। আমি আমার ঈমান বাঁচাবার জন্য যাচ্ছি। তোমাদের চেয়ে ঈমান আমার বেশী প্রিয়। স্ত্রীও তাকে খুশী হয়ে বিদায় দিলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্‌র মঞ্জুর হলে আবার আমাদের দেখা হবে। হযরত উম্মু সালমা (রা)-এর কোলে তখন বাচ্চা। এসময় আবু সালমা (রা)-এর কবীলা বনু আসাদের লোকেরা এসে বলল, আমরা আমাদের গোত্রের ছেলেকে তার মা'র কোলে থাকতে দেবনা—এই বলে মা'সুম ছেলেটিকে তারা তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এই দুঃখজনক ঘটনার পর হযরত উম্মু সালমা (রা) প্রতিদিন

সেখানে গিয়ে স্বামী ও সন্তান শোকে কাঁদতেন এবং সেদিনের বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করতেন। এক বছর কেটে গেল এভাবেই। শেষাবধি তাঁর গোত্রের একজন মহান ও সজ্জন ব্যক্তি হযরত উম্মু সালমা (রা)-এর শোকে ও দুঃখে ব্যথিত হন এবং বলে ওঠেন, কতদিন এই মূক মহিলা এখানে এসে কাঁদবে, চোখের পানি ফেলবে আর তার স্বামীর স্মৃতিচারণ করবে? এ কী জুলুম আর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা! অবশেষে একজন সহৃদয় আল্লাহর শরীফ বান্দা[১] প্রস্তুত হলেন এবং হযরত উম্মু সালমা (রা) কে বললেনঃ বোন, তুমি সুস্থ হও। আমি তোমাকে মদীনায় পৌঁছে দেব। ইতিমধ্যে বনু আসাদের দিলেও দয়ার উদ্রেক হল এবং শিশুকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল। উম্মু সালমা (রা) বলেনঃ লোকটি এত শরীফ ছিল যে, আমার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি আগে আগে নেমে গিয়ে দূরে সরে দাঁড়াতেন। সারা পথে আমার দিকে তিনি চোখ তুলে তাকাননি।[২]

এরপর হযরত সুহায়ব রূমীর ঘটনা স্মরণ করুন। তিনি ছিলেন মক্কার একজন বিখ্যাত কারিগর ও হস্তশিল্পী। তিনি যখন মদীনাপানে চললেন, অমনি কাফিররা এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। তারা বললঃ সুহায়ব! কোথায় যাচ্ছ তুমি? তিনি জওয়াব দিলেন, 'ভাই আমি আমার দীন ও ঈমান বাঁচাতে যাচ্ছি, যেখানে গিয়ে স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌র নাম নিতে পারব সেখানে যাচ্ছি।' তারা বললঃ ঠিক আছে, তুমি মদীনায় যেতে পার, কিন্তু আমাদের শহরে থেকে সারা জীবন যে কামাই উপার্জন করলে, সে সব নিয়ে যাবে কোন অধিকারে? না, তা হবে না। এসব আমাদের ধন-সম্পদ, এখানে থেকে তুমি লাভ করেছ, কামাই করেছ। তুমি যাচ্ছ যাও, কিন্তু এর একটি পয়সাও আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে দেবনা। সুহায়ব (রা) বললেনঃ ভাল কথা। রইল এসব মাল। আমি ঝুলি উজাড় করে সব তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। এবার তোমরা খুশী হলে ত? তারা রাজী হলে তিনি বললেন, ''নিয়ে যাও সব।'' এই বলে সারা জীবনের পুঁজি তিনি তাদের হাতে তুলে দিয়ে হৃষ্ট চিত্তে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে করতে সেখান থেকে চলে গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সুহায়ব বিরাট কামাই করেছে। তার ক্ষতি হয়নি এতটুকুও।[৩]

---

১. উছমান বিন তালহা যিনি পরে কা'বার কুঞ্জী রক্ষক হয়েছিলেন।

২. সীরতে ইবনে কাছীর, ২য় খন্ড, ২১৫-১৭; ৩. ঐ ৪র্থ খন্ড, ২৪০পৃঃ;

আপনারা সবাই জানেন যে, দীন ও ঈমানের জন্য প্রথম যুগের লোকেরা জীবন দিয়েছে। আর এতো জানা কথা যে, জীবনের চেয়ে বেশী দামী ও মূল্যবান আর কিছু নেই। এর পর তারা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেছে, ধনসম্পদ ছেড়েছে এবং অনেক লোক রাজ্যপাটও ছেড়েছে। আল্লাহর এমন বান্দাও গুজরে গেছেন যাদের নাম পরবর্তী সুলতান কিংবা বাদশাহ ঘোষণা করা হয়েছে। যারা ছিলেন শাহযাদা। তাদের রাজ্য ছিল, ছিল রাজত্ব। কিন্তু তাদের অন্তর পরিতৃপ্ত ছিল না। তারা মনে করতেন রাজ্য চালাতে গিয়ে অনেক অন্যায় কাজ করতে হয়। আখিরাত তথা পারলৌকিক জীবনের যে প্রস্তুতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে তা এখান থেকে হবার নয়। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহামের নাম আপনারা শুনে থাকবেন। তিনিও এমনটিই ছিলেন। আরও কয়েকজন বুযর্গ এমন ছিলেন। রুকনুদ্দীন আলাউদ্দৌলা সিমনানী, সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানীও ইরানে রিয়াসত ও সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন। তিনি সেসবে পদাঘাত করে চলে আসেন এবং আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। তারা বললেনঃ আমরা আল্লাহর মা'রিফত (পরিচয়) লাভ করতে চাই এবং তাঁর রেযামন্দির জন্য আমারা জীবনে বাজী ধরব।

ভায়েরা আমার!

আপনারা আপনাদের স্বদেশ ভূমি ছেড়েছেন। আপনাদেরকে মুবারকবাদ জানাই। আসলে আল্লাহ দেখতে চান যে, আমার বান্দা কি জিনিসের বিনিময়ে কি ছাড়ল। ছাড়ার মত দুনিয়ায় তো বহু জিনিসই আছে। আমরা আপনারা সকলেই প্রত্যহ সকাল সাঝে দেওয়া-নেওয়ার কাজ করি। উদাহরণত, আপনি বাজারে গেলেন, কিছু সওদা করলেন, কিছু পয়সা ছাড়লেন আপনি। এর অর্থ আপনি কিছু পয়সা দিলেন। বিনিময়ে তরকারী নিলেন। আপনি দাম দিলেন, কাপড় খরিদ করলেন, অফিসে গিয়ে কাজ করে আসলেন, নিয়ে আসলেন বেতন। মোট কথা, ছেড়ে আসা এবং গ্রহণ করা, অপর কথায় দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা মানুষের জীবনের নিত্যকার বিষয়। এখানে দেখার বিষয় এই যে, আপনি কি ছাড়লেন এবং কার জন্য ছাড়লেন? আল্লাহপাক এটাই দেখেন। হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় স্ত্রী হাজেরা এবং দুগ্ধ পোষ্য শিশু ইসমাঈল (আ) কে মক্কার বিজন প্রান্তরে ছেড়ে চলতে লাগলেন। হযরত হাজেরা (রা) জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি আমাদেরকে কিসের ভিত্তিতে ছেড়ে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তরে জানালেনঃ আল্লাহর নির্দেশে। হযরত হাজেরা বললেনঃ তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই আমাদের। আপনি যদি

আল্লাহ্‌র নির্দেশে আমাদেরকে রেখে যান তাহলে আমাদের কোন ভয় নেই। আপনারা দেখুন, আল্লাহ্ তাঁদের এ আমলকে কিভাবে কবুল করেছেন যে, সারা দুনিয়া সেখানে গিয়ে হাযির হয় আর কত আগ্রহভরে যায়। উড়ে যেতে চায়। তাদের মন চায়, আহা! দু'টো পাখা যদি পেতাম, আর মুহূর্তেই যদি সেখানে পৌঁছে যেতে পারতাম! হযরত ইবরাহীম 'আলায়হি'স-সালাম নিজের ঘর-বাড়ি, স্বদেশভূমি ছেড়ে হযরত হাজেরাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা হাজারো লাখো মানুষকে সেখানে নিয়ে যান, তাদেরকে দৌঁড়ান, ঘোরাফেরা করান। হযরত হাজেরা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্য পানির সন্ধানে সাফা থেকে মারওয়া এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত দৌঁড়েছিলেন, আজ আল্লাহ্ তা'আলা যুগের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি নেতাকে সেখানে নিয়ে দৌঁড়ান এবং বলেনঃ হাজেরার এই আমল পসন্দ করেছি আমি। অতএব তার স্মরণে তোমরাও দৌঁড়াওঃ ঠিক সেইভাবেই দ্রুত দৌঁড়াবে সেখানে হাজেরা দ্রুত দৌঁড়েছিল, আর হাজেরা যেখানে ধীরে চলেছিল, তোমরাও সেখানে ধীরে চলবে। আপনাদের ভেতর যারা সেখানে গিয়েছেন তারা এ দৃশ্য দেখেছেন।

ভায়েরা আমার!

আসলে দেখতে হবে আমাদের যে, আমরা কি জিনিষ ছাড়লাম এবং কার জন্য ছাড়লাম। কি ছাড়লাম তার গুরুত্ব ততটা নয় যতটা বেশী গুরুত্ব কার জন্য ছাড়লাম-এর। এর গুরুত্ব খুবই বেশী। আমার মুহব্বতে ছেড়েছ, আমার নামের উপর ছেড়েছ, ব্যস! আল্লাহ্ এটাই পসন্দ করেন, ভালবাসেন। যদি কেউ রাজসিংহাসনও পরিত্যাগ করে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হয় অন্যবিধ (যেমন সম্রাট ৮ম এডওয়ার্ড মিসেস সিম্পসন নামের জনৈকা আমেরিকান মহিলার প্রেমে বৃটিশ রাজসিংহাসন ছেড়েছিলেন।—অনুবাদক) আল্লাহ্‌র নিকট তার কানাকড়িরও মূল্য নেই। কিন্তু আপনি যদি একটি পয়সাও ছেড়ে থাকেন এবং তা আল্লাহ্‌র নামে ছেড়ে থাকেন, আল্লাহ্‌র মুহব্বতে ছেড়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তার মূল্য আছে, কদর আছে। তা আসল দেখার বিষয় এই যে, আপনারা আপনাদের দেশ ছেড়েছেন কিসের জন্য? আমরা যতদূর জানি, আপনারা আপনাদের দেশ ছেড়েছেন নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য। আর ঈমান এমনই এক বস্তু যে, মানুষ যদি দূর থেকেও বুঝতে পারে যে, ঈমানের জন্য বিপদ অপেক্ষা করছে তাহলে সে

চিৎকার করে কেঁদে উঠবে। হাদীছে এসেছে যে, তিনটি বিষয় এমন যে, যার ভেতরই এ তিনটির সমাবেশ ঘটবে—ঈমানের সমস্ত গুণই তার ভেতর জমা হ'ল। তার ভেতর একটি হ'ল এই যে,

من يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار

যে ব্যক্তি কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তনকে এমনভাবে অপসন্দ করবে যেমন অপসন্দ করে মানুষ আগুনের মাঝে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।

টরেন্টো (কানাডা) তে ভারতীয়, পাকিস্তানী ও আরবীয় মুসলমানদের এক সমাবেশে বক্তৃতা[১] করতে গিয়ে আমি তাদেরকে বলেছিলামঃ দেখুন, ভায়েরা আমার! যদি তোমরা জেনে থাক যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষে ইসলামের উপর টিকে থাকা সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের ঈমান বিপদ ও হুমকীর সম্মুখীন—তাহলে আমি পরিষ্কার বলছি এবং ফতওয়া দিচ্ছি যে, তোমাদের যদি হেটেও স্বদেশে গিয়ে পৌঁছুতে হয় তবুও তোমাদেরকে এখানে থেকে চলে যেতে হবে। সমস্ত চাকুরী-বাকুরী, সকল পদ ও পদমর্যাদা এবং সব প্রমোশন ও আয়-উন্নতি পেছনে ঠেলে তোমরা যে কোন মুসলিম দেশে চলে যাও এবং এখনই বেরিয়ে পড়। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, আমরা মুসলমান,---আমার প্রিয়ভাজনেরা তা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত নই। আমাদের ভয়, আমাদের পুত্র-পৌত্র ও দৌহিত্ররা ইসলামের উপর কায়েম থাকতে পারবে কিনা---এই নিয়ে। যদি তোমাদের ভয় হয় এবং তোমরা আশংকা কর যে, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের সন্তানদের সন্তান-সন্ততি,---খোদা-না-খাস্তা—মুরতাদ হয়ে যাবে, ইসলাম থেকে সরে যাবে---তাহলে তোমাদের পক্ষে সেখানে থাকা হারাম। কেননা আল্লাহ্ বলেছেনঃ

ان الذين توفهم الملئكة ظالمي انفسهم قالوا

১. এ বক্তৃতা "নঈ দুনিয়া আমেরিকা মেঁ সাফ সাফ বাতেঁ" নামক বক্তৃতা সংকলনে পাওয়া যাবে।

فيم كنتم ط قالوا كنا مستضعفين في الارض ط قالوا

الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ط

"যারা নিজেদের উপর জুলুম করে—তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তারা বলে, 'দুনিয়ার আমরা অসহায় ছিলাম'; তারা বলে, 'দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিলনা যেথায় তোমরা হিজরত করতে'?"

একটু এগিয়েই আল্লাহ্ বলেনঃ

فاولئك ماوٰهم جهنم ط وساءت مصيرا ○

"ওদের আবাসস্থল জাহান্নাম, আর কত নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল!" সূরা নিসা, ৯৭ আয়াত;

আল্লাহ্‌র শোক্‌র যে, আমার সে কথাকে আজও তারা স্মরণ রেখেছে। সেখান থেকে লোক আসে, বলেঃ আপনার সেই বক্তৃতা আজও আমাদের কানে বাজছে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আফ্রিকায় আমরা মোটরে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। লোকে টেপ রেকর্ডার চালু করল। টেপ থেকে আপনার বক্তৃতা ভেসে আসছিল আর আপনি বলছিলেনঃ যদি এখানে তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং ভবিষ্যত বংশধরদের পক্ষে ইসলামের উপর কায়েম থাকা কঠিন হয়ে দাড়ায় তাহলে তোমাদের জন্য এই ভূখণ্ডে থাকা একদিনের জন্যও জায়েয নয়,---তা তোমাদের উপর আসমান থেকে স্বর্ণবৃষ্টিই ঝরুক কিংবা মাটি ফুড়েই তা বেরিয়ে আসুক।

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে, যদি তারা দুনিয়ায় বেঁচে না থাকে, বেহেশতে উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা দান করুন,---আর জীবিত থাকলে আল্লাহ তাদের জীবনে বরকত দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তারা তোমাদের ঈমান বাঁচাবার জন্য এতবড় কুরবানী দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের হিজরতকে এমনভাবে কবুল করেছিলেন যে, সেই নামে স্থায়ী পঞ্জিকাই কায়েম করে দিয়েছেন। এটাও এক আকস্মিক ঘটনা যে, কাল ছিল ১৪০২ হিজরীর

পহেলা দিবস। এ সালের পয়লা দিন মুহাজিরদের মাঝে কাটাবার সুযোগ পেলাম যে সাল শুরু হয় হিজরত থেকে। আমার পরামর্শ দেবার সাধ জাগে যে, আপনারা একটি ব্লাক বোর্ড তৈরী করুন। তার উপর উর্দূ কিংবা তিব্বতী হরফে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখুন, "আমরা আমাদের স্বদেশ-ভূমি ত্যাগ করেছিলাম কেন? আমরা কেন তিব্বতকে বিদায়ী সালাম জানিয়েছিলাম?" একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। যার নজরই এর উপর পড়বে সেই মনে করবে যে, আমাদের দেশ তো আমাদের কেটে খাচ্ছিল না। এতটা খারাপও ছিল না যে, সেখানে তিষ্ঠানো যেতনা! আমরা আমাদের দেশ ছেড়েছিলাম ঈমানের খাতিরে। জিজ্ঞাসার চিহ্ন তার হৃদয়ের মণি-কোঠায় জাগরুক থাকুক আর নিজেকেই সে জিজ্ঞাসা করুক, 'কেন তুমি তোমার দেশ, তোমার জন্মভূমি ছেড়েছিলে?' তার মন ও মগজ এর উত্তর দিক যে, আমরা হিজরত করেছিলাম নিজেদের ঈমান বাঁচাবার জন্য, নিজের শিশু-সন্তান, স্ত্রী-পুত্র, পৌত্র-দৌহিত্র ও তাদের বংশধরদের ঈমান বাঁচাবার জন্য। আপনারা কখনোই একথা ভুলবেন না। মানুষ সাধারণত অল্প দিনেই ভুলে যায়। অনেকেই ভুলে গেছে যে, আমাদের বাপ-দাদা এখানে কেন এসেছিলেন আর কেই-বা তাদের আসতে বাধ্য করেছিল। এর পর তারা একই রঙে রঞ্জিত হয়। খানাপিনা ও রুটি-রুযীর ধান্ধায় লেগে যায়। এক সময় দেখা যায়, তাদের নামাযের কথাও ভুল হয়ে গেছে। নামাযের সময় হয়ে ওঠে না অনেকের। ধর্মীয় শিক্ষার ধারাবাহিকতাও যায় খতম হয়ে। আল্লাহ্‌র স্মরণও ভুল হয়ে যায়। শেষাবধি তারা স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়। আমি চাই যে, এমন কিছু করা হোক যা দেখে আপনারা সব সময় সতর্ক হতে পারেন। তা আপ-নাদের কাঁটার ন্যায় ফুটবে এবং যা আপনাদের কোন সময় গাফিল হতে দেবে না। অথবা আপনারা মাঝে মাঝে সমাবেশের আয়োজন করুন এবং সেখানে আপনারা পরস্পরকে একথা স্মরণ করিয়ে দিন। আমি অবশ্য একথা বলছিনা যে, এটাই একমাত্র পন্থা যে, কিছু লিখে দেওয়ালে সেঁটে দিন। কিছু দিন পর এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর দরকার পড়বে আরেকটা নতুন কিছুর। এরপর সেটাও আবার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হবে। এরপর দরকার পড়বে তৃতীয় কিছুর। দেওয়ালে নয়, আপনারা বরং আপনাদের মনের পর্দায় লিখে নিন যে, 'আমরা তিব্বত কেন ছেড়েছিলাম? আমরা আমাদের প্রিয় স্বদেশ ও বাসভূমি কেন ছেড়ে-

ছিলাম?' সব কিছু বরদাশ্‌ত করুন কিন্তু ঈমানের ক্ষতি বরদাশ্‌ত করবেন না—যার জন্য আপনারা আপনাদের দেশ ছেড়েছিলেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ○

"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শোনে নিবিষ্ট চিত্তে।" সূরা কাফ, ৩৭ আয়াত;

দাওয়াত এবং দাওয়াতের হিকমত (১)

(১৯৮১ সালের ২রা নভেম্বর মুতাবিক ৪ঠা মুহার্‌রাম, ১৪০২ হিজরীর সকাল ১০টা জম্মু ও কাশ্মীর জমঈয়তে আহলে হাদীছ-এর সদর দফতরে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। সমাগতদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই ছিল উলামায়ে কিরাম, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও চিন্তাশীল সুধী।)

খুতবা পর!

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن

ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশে দ্বারা এবং ওদের সঙ্গে আলোচনা কর সদ্ভাবে। তোমার প্রতি-পালক তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।" সূরা নহল, ১২৫ আয়াত;

১. যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।

সুধী মণ্ডলী!

আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'ইযযত-এর সম্বোধন তাঁর আখেরী নবী (সা)-এর মাধ্যমে আখেরী উম্মতের জন্য। কেননা এই উম্মতের পর আর কোন উম্মত নেই। পঠিত আয়াতটি সূরা নহলের শেষ রুকূ'-র যার ভেতর দাওয়াত ও ইরশাদের তরীকা ও পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ঐশী ফরমান ঃ "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা।"

হিকমত দ্বারা বুঝায় জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, ব্যবহারিক রীতিনীতি, সুকৌশল, সত্যিকার ও বিশুদ্ধ কথাকে পরিষ্কারভাবে মানুষের মনের মর্মমূলে গেঁথে দেবার তরীকা বা পন্থা যেন অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোষকামিতা কিংবা সুযোগ-সন্ধানী মানসিকতার বিন্দুমাত্র নাম-গন্ধও না থাকতে পারে। রাজনীতির কোন ভূমিকা না থাকে যেন। কেননা রাজনীতি আলাদা জিনিষ এবং হিকমত ও সদুপদেশ আলাদা।

স্বীয় যুগের আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও মাহবূব বান্দা মূসা 'আলায়হি'স-সালামকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সেযুগের আল্লাহ্র সবচেয়ে ক্রোধে নিপতিত জালিম ফেরাউনের নিকট গিয়ে তাকে দাওয়াত জানাবার। কিন্তু তাঁকে ব্যবহারিক রীতিনীতি অনুসরণের এবং নম্র ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

اذهبا الى فرعون انه طغى ۝

"তোমরা দু'জনে (মূসা ও হারূন) ফেরাউনের নিকটে যাও; সে বিদ্রোহ করেছে।" সূরা তাহা, ৪৩ আয়াত;

এই বিদ্রোহী ও সীমা অতিক্রমকারীর সঙ্গেও দাওয়াতের কি তরীকা অবলম্বন করতে হবে?

فقولا له قولا لينا

"তোমরা উভয়ের তার সঙ্গে নম্রভাষায় কথা বলবে।" —সূরা তাহা, ৪৪ আয়াত;

কথা হবে পাকাপোক্ত ও সত্য, কিন্তু কথা বলার ধরন হবে ব্যবহারিক রীতিনীতি মাফিক কোমল ও মিষ্টি মধুর।

لعله يتذكر او يخشى ۝

"সম্ভবত সে (ফেরাউন) উপদেশে কান দেবে অথবা (আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে) ভীত হবে।" সূরা তাহা, ৪৪ আয়াত;

যাতে করে সে উপদেশ গ্রহণ করে অথবা ব্যবহারিক আচরণ দৃষ্টে ও শিষ্টাচারমূলক কথা শুনে তার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং সে তার অবাধ্যতা, সীমালঙ্ঘন, অনাচার, অরাজকতা ও কুফরী থেকে বিরত হয়। আর যদি ভাল কথা বলার ধরণ হয় খারাপ তাহলে তা ফলপ্রসূ হয় না। কবি সত্যই বলেছেন ঃ

کہتے ہوں وہ بھلے کی و لیکن بری طرح

"সে কথা ভালোর বলে বটে, কিন্তু বলে খারাপ ভাবে।"

ভালো কথা ভালভাবে বলার নামই উত্তম ব্যবহারিক রীতি এবং হিকমত। যদি প্রতিপক্ষকে সওয়াল-জওয়াবও করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও ব্যবহারিক রীতি অনুসরণ করা উচিত। বিতর্ক ও পরস্পরে বাদানুবাদের ক্ষেত্রেও তার প্রতি আল্লাহর এই নির্দেশ ঃ

و جادلهم بالتى هى احسن ط

"আর সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হও।" সূরা নহল, ১২৫ আয়াত;

যাতে করে শ্রোতা ও দর্শক দাওয়াত প্রদানকারীর (দা'ঈর) যুক্তি উপস্থাপনের পন্থাদৃষ্টে প্রভাবিত হতে পারে, চাই কি প্রতিপক্ষের উপর এর কোন প্রভাব নাই পড়ুক। যদি আলোচনা-সমালোচনা এ বিতর্ক সর্বোত্তম পন্থায় হয় আর প্রতিপক্ষ যদি হয় সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী সৎস্বভাবের তাহলে সে নিজেও প্রভাবিত হবে। আর তা যদি নাও হয় তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, উপস্থিত দর্শক ও শ্রোতার উপর উত্তম আলোচনার প্রভাব অবশ্যই পড়বে। এটাই ---

إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ط ولم يك من المشركين ٥

(ইবরাহীম ছিল এক সম্প্রদায়ের প্রতীক; সে ছিল আল্লাহ্‌র অনুগত, একনিষ্ঠ আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সূরা নাহল, ১২০ আয়াত;) আয়াতের হাকীকত থেকে প্রতীয়মান হয়, তাঁকে যুক্তি ও প্রমাণপঞ্জী উপস্থাপনার তরীকা ও পন্থা, ব্যবহারিক রীতিনীতি, হিকমত ও সদুপদেশ এবং সর্বোত্তম বিবাদ-বিতর্ক সত্ত্বেও—

حنيفا مسلما ط وما كان من المشركين ٥

(একনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সূরা আল-ইমরান, ৬৭ আয়াত) খেতাব দান করা হয়েছে। আর তা এজন্য যে, তাঁর দাওয়াতের ভেতর হিকমত ছিল, আপোষকামিতা ছিল না; সারল্য ছিল, কিন্তু রাজনীতি ছিল না। অতএব একজন মু'মিন মুসলমানকেও এই তবলীগী পদ্ধতি অবলম্বন ও অনুসরণ করা আবশ্যক। আকীদার ইসলাহ তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের সংস্কার ও সংশোধনের জন্যেও ادع الى سبيل ربك بالحكمة -এর কর্মপন্থা গ্রহণ করাই উপকারী ও ফলপ্রসূ। কথা যতই জরুরী ও অপরিহার্য হোক না কেন, দা'ঈ-র সামনে এটাই লক্ষ্য থাকতে হবে যে, আমাকে রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। তার ভেতর থাকতে হবে স্নেহ-ভালবাসা ও বিনয়-নম্রতা। কঠোরতা, রুক্ষতা, উগ্রতা ও বদমেযাজীর কারণে রোগী অভিজ্ঞ বিখ্যাত চিকিৎসক ও হেকীমের নিকট যেতেও ভয় পায়। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার ব্যাপারটাই আলাদা। উম্মাঃ নিম্নোক্ত পয়গাম লাভ করে ঃ

لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ٥

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদা)য়ক; সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি (বিশেষভাবে) সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" সূরা তওবাহ, ১২৮ আয়াত।

এ আয়াতের উপর আমল করা তাঁর একজন উম্মতের উপরও অপরিহার্য। তারা (উম্মতে মুহাম্মদী) যেন অপর মানুষকে কার্যকর হিকমত, মুহব্বত ও প্রীতির সঙ্গে দাওয়াত দিয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে-সুজিয়ে 'আকীদার ইসলাহ্‌র জন্য কাছে টানেন এবং উদ্বুদ্ধ করেন। আঁ-হযরত (সা)-এর তাবলীগী চিন্তা-ভাবনা ও অন্তর্জ্বালার অবস্থা কিরূপ ছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ٥

"ওরা এই বাণী বিশ্বাস না করলে ওদের পেছনে পেছনে ঘুরে সম্ভবত তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।" সূরা কাহফ, ৬ আয়াত;

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ٥

"ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মঘাতি হয়ে পড়বে।" সূরা শু'আরা, ৩ আয়াত;

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মুহব্বত ও অন্তরের ব্যথাভরা কামনা ছিল, প্রতিটি মানুষ তার মালিক মুখতার (আল্লাহ্)-এর আস্তানায় তাদের মস্তক ঝুকিয়ে দিক এবং কেউ যেন তাঁর দরজা থেকে মাহরূম ফিরে না যায়। হযরত আলী (কা)-কে তিনি বলেন ঃ

لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ٥

"দুর্লভ লাল উটের চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান তোমর জন্য যদি একজন মানুষও তোমার মাধ্যমে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়।"

মুবাল্লিগকেও একজন দরদমন্দ ও বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত রোগীর কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে চিকিৎসা করতে হবে। হেকীম কিংবা চিকিৎসাকের লক্ষ্য থাকবে রোগীকে মেরে ফেলা নয়; বরং তাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তোলা। মুবাল্লিগকে তওহীদী আকীদার কথা একেবারে পষ্ট করে বলতে হবে এবং শিরক সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে, ঔষধ মাফিক যেন পথ্যের ব্যবস্থা করা হয়। যদি ঔষধ বেশি শক্তিশালী কিংবা পরিমাণ ও মাত্রায় বেশী হয় অথবা সব ডোজ যদি এক-বারেই রোগীকে খাইয়ে দেওয়া হয় কিংবা ঔষধ রোগীর সহ্যশক্তির তুলনায় যদি বেশী হয় তাহলে রোগী বাঁচবে না, নির্ঘাত মারা যাবে। বিষয়টি আমি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে গল্পের মাধ্যমে পেশ করতে চাই যাতে তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সবার জন্য অধিক বোধগম্য হয়।

দেখুন, আল্লাহ্‌র যেসব বান্দাহ্‌র দিলে ইশ্‌কে ইলাহীর আগুন লেগেছিল তারাও কিভাবে হিকমতের সঙ্গে কাজ করেছেন।

শায়খ জামালুদ্দীন ইরানী কোথাও যাচ্ছিলেন। তাতারীরা মুসলিম সালতানাতগুলোকে ধ্বংসের চূড়ান্ত করে ছেড়েছিল। ঘটনাচক্রে ঠিক সেদিনই তুগলক তায়মুর নামক জনৈক তাতারী শাহযাদা শিকারের উদ্দেশ্যে বাইরে বেরিয়েছিলেন। এই শাহযাদা ছিলেন তাতারীদের চুগতাঈ শাখার যুবরাজ যারা ইরানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করছিলেন। শাহযাদার শিকার ক্ষেত্রে শায়খ জামালুদ্দীন আকস্মিকভাবেই ঢুকে পড়েন। পাহারাদার তাঁকে পাক-ড়াও করে শাহযাদার সামনে হাযির করে। শাহযাদা এই ফকীরবেশী মুসলমান—তাও আবার ইরানী-কে দেখে (সে সময় তাতারীরা ইরানীদেরকে খুবই ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখত) যাত্রা অশুভ বলে মনে করেন এবং অত্যন্ত কুপিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ বল,---এই কুকুর ভাল না তুমি? শাহযাদা অত্যন্ত ক্রোধভরে কথা বলছিলেন। শায়খ জামালুদ্দীন তার উত্তর দেন অত্যন্ত ভাব-গম্ভীর স্বরে ও বিবেচক ভঙ্গীতে। তিনি বলেন ঃ এর অকাট্য ফয়সালা দেবার মওকা এটা নয়। শাহযাদা বললেন ঃ তাহলে এর উপযোগী মওকা কখন আসবে? শায়খ বললেন ঃ আমার অন্তিম মুহূর্তে অর্থাৎ আমার মৃত্যুর মুহূর্তে এটা জানা যাবে। আমি যদি নিখিল

বিশ্বের স্রষ্টা যিনি একক ও অংশীহীন, তাঁর সঠিক পরিচয় ও স্বীকৃতির উপর শেষ নিশ্বাস ফেলতে পারি তাহলে আমি আপনার কুকুরের চেয়ে উত্তম বলে প্রমাণিত হব। এর অন্যথা হলে এই কুকুরটিই আমার আমার চেয়ে উত্তম ও ভাগ্যবান বিবেচিত হবে। শায়খ-এর উত্তর শাহযাদার মনের বদ্ধ কপাটে আঘাত হানে। শাহযাদা শায়খকে বলেন ঃ তুমি যখন শুনবে যে, আমি সিংহাসনে সমাসীন হয়েছি ঠিক সেসময় আমার সঙ্গে দেখা করবে। শাহযাদার যুবরাজ থাকাকালীন যুগেই শায়খ জামালুদ্দীন-এর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। তিনি তাঁর পুত্র (শায়খ রশীদুদ্দীন) কে কাছে ডেকে বলেন ঃ আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার কাঁধে যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল—আমি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারলাম না। আমি আশা করছি, তুমি তা পূর্ণ করতে পারবে—এই বলে তিনি সকল ঘটনা বিবৃত করলেন।

শায়খ জামালুদ্দীনের ওফাতের পর যুবরাজ সিংহাসনে বসতেই শায়খ-পুত্র তার পিতার ওসিয়ত (অন্তিম উপদেশ) মাফিক রওয়ানা হলেন। শাহী-মহলের বহিঃফটকে সিপাহীরা তাঁকে বাধা দেয় এবং দরজা থেকে ফিরিয়ে দেয়। তিনি নিকটেই এক গাছের ছায়ায় জায়নামায বিছান এবং সুবহে সাদিকে ফজরের আযান হাঁকেন। বাদশাহ্‌র ঘুম ভেঙে যায় আযানে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, ছিন্ন বেশধারী আলখাল্লা পরিহিত একটি লোক মহলের বাইরে বসে আছে। সেই আওয়াজ হেঁকেছে যার ফলে বাদশাহ্‌র ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। বাদশাহ্ রেগে গিয়ে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। সিপাহীরা তক্ষুনি গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে এল। বাদশাহ্‌র জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি তাঁর পিতার সালাম পেশ করে বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার পিতার শেষ বিদায় ঈমানের সঙ্গেই হয়েছে। আশা করি আপনার কৃত প্রশ্নের উত্তর এর ভেতর আপনি পেয়ে গেছেন, এই বলে তিনি বাদশাহ্‌কে তার যুবরাজ থাকাকালীন শিকার ক্ষেত্রে সংঘটিত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেন। বাদশাহ্‌র মনের উপর এ ছিল দ্বিতীয় আঘাত। তিনি তৎ-ক্ষণাত তার ইসলাম গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে সাম্রাজ্যের উযীর-ই-আজমকে ডেকে পাঠান এবং তাকে এ ঘটনা বিবৃত করেন। উযীর উত্তরে জানান যে, আমি তো জাহাঁপনা অনেক আগেই মুসলমান হয়ে গেছি। এতদিন তা প্রকাশ করিনি। আর এভাবেই ইরানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এই চুগতাঈ তাতারী শাখা রাজ্যের পারিষদবর্গ ও সেনাবাহিনী সমেত ইসলামের

ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেয়।[১] এভাবে একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা কিভাবে ইরানী তাতারী সাম্রাজ্যে ইসলামের প্রসার ঘটান যে, গোটা তাতারী জাতিগোষ্ঠিই মুসলমান হয়ে যায়।

এই ধরনেরই আরেকটি ঘটনা আমি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি।

মওলানা ইয়াহ্‌ইয়া 'আলী সাহেব ছিলেন হযরত মওলানা বিলায়েত আলী সাদিকপূরীর[২] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সীমান্তের মুজাহিদদেরকে সাহায্য দেবার অভিযোগে (যারা হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভীর শাহাদত লাভের পর তাঁর আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন) ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে ফাঁসীর দণ্ড প্রদান করা হয়। তাঁকে আম্বালা জেলের একটি সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী রাখা হয়েছিল। কুঠরীতে আলো-বাতাস প্রবেশের কোন রাস্তা ছিল না। সেদিন ছিল ভীষণ গরম। জেল কর্মকর্তা কারাগার পরিদর্শনে এসে এ অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারেন যে, এমতাবস্থায় তো তিনি মারা যাবেন। এখনও মোকদ্দমা চলছে। তিনি কুঠরীর দরজা খোলা রাখার নির্দেশ দেন এবং সেখানে সান্ত্রী মোতায়েন করেন। গুর্খা কিংবা শিখদেরকেই সাধারণত সান্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হত। এসব সান্ত্রী ডিউটিতে এসে হাযির হলেই তিনি হযরত য়ূসুফ (আ.)-এর ভাষায় তাদেরকে সম্বোধন করতেনঃ

يٰصاحبي السجن ءارباب متفرقون خير ام الله

الواحد القهار ○ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها

انتم و اباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ○ ان الحكم

১. এ ঘটনা ইরানী ঐতিহাসিকগণ এবং প্রোফেসর আর্নল্ড তাঁর Preaching of Islam নামক গ্রন্থে শব্দের সামান্য তারতম্য সহকারে বর্ণনা করেছেন। আলোচক তাঁর 'তারীখ-ই দাওয়াত ও আযীমত' (ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ১ম খণ্ড নামে কিছু কাল আগে প্রকাশিত হয়েছে।—অনুবাদক)-এর ১ম খণ্ডে তা উদ্ধৃত করেছেন।

২. মওলানা বিলায়েত আলী ছিলেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা।

الا لله ○ امر الا تعبدوا الا اياه ○ ذلك الدين القيم و لكن

اكثر الناس لا يعلمون ○

"হে কারা সংগীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কতগুলি নামের ইবাদত করছ যা তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই। তিনি আদেশ করেন অন্য কারুর ইবাদত না করতে। এটাই সরল দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" সূরা য়ূসুফ, ৩৯-৪০ আয়াত;

তিনি এ আয়াতের তেলাওয়াত করতেন, করতেন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আর তা শুনে এসব পাহারাদারের চোখ ফেটে পানি বের হত এবং তারা নীরব ও নিথর হয়ে যেত। যখন তাদের ডিউটি অন্যত্র বদলে দেওয়া হত তখন তারা তোষামোদ করত যেন তাদের ডিউটি এখানে রাখা হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন,—তাদের ভেতর কত আল্লাহ্‌র বান্দার মনে তওহীদের বীজ উপ্ত হয়েছে এবং ঈমান লাভের সুযোগ ঘটেছে।

ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটেছে মওলবী মুহাম্মদ জা'ফর (থানেশ্বরী)-এর বেলায়। তাঁকে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তথাপি তাঁর চেহারায় উদ্বেগ কিংবা দুশ্চিন্তার লেশমাত্র ছিলনা। ইংরেজ দর্শকরা এতদ্দৃষ্টে বিস্মিত হয়ে বলত, 'ব্যাপার কি'? তিনি বলতেন, 'এমৃত্যু মৃত্যু নয়, এর নাম শাহাদত। আর শাহাদত এমনই এক নেয়ামত যার মুকাবিলায় তামাম দুনিয়ার সাম্রাজ্যেরও এক কানাকড়ির মূল্য নেই।' সেখানেও তিনি হিকমতের সঙ্গে তবলীগে দীনের দায়িত্ব আনজাম দিতেন। জেলে থাকাকালে এবং পোর্ট বেলিয়ার-এও তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ তওহীদের দাওয়াত দিতেন, তবলীগ করতেন। এর ফলে আল্লাহ্‌র বহু বান্দার হেদায়েত নসীব হয়।

মওলানা ইয়াহ্‌ইয়া আলী (রা.)-এর নিকট এক রাত্রে জনৈক কুখ্যাত ও দাগী আসামীর বিছানা নিয়ে আসা হয়। সে যখন মওলানার ইবাদত-বন্দেগী, দু'আ ও মুনাজাত এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটির অবস্থা

প্রত্যক্ষ করল,—অমনি সে তওবা করল তার অতীত পাপ থেকে এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদগুযারে পরিণত হল। জেলে বিশজনের মত আল্লাহ্র বান্দা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের জীবনের গতিধারাই পাল্টে যায়।

এমনিভাবে আল্লাহ্র বান্দাহ্দের মধ্যে যখন অন্তরের জ্বালা এবং মস্তিষ্কের আলো এসে দেখা দেবে এবং এদু'টো যখন পরস্পরে মিলিত হয়ে কাজ করবে তখন ফলাফল সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। একজন শিকারী যখন জন্তু শিকার করতে গিয়ে হিকমতের আশ্রয় নেয় তখন একজন মুবাল্লিগও তার পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে হিকমত অবলম্বন করবেন। কেননা তার উদ্দেশ্য আরও মহৎ। শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি। এর চিকিৎসাও হিকমতের সঙ্গে করা আবশ্যক। কথা বলার ভঙ্গী হবে কোমল ও মোলায়েম,—কিন্তু কথা হবে খাটি ও নির্ভেজাল যাতে করে শ্রোতা যদি অন্তরঙ্গ হয় তাহলে চিকিৎসার প্রতিক্রিয়া যথাসত্বর দেখা দেবে। শির্ক সম্পর্কেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ان الله لا يغفر ان يشرك و يغفر ما دون ذلك

لمن يشاء ○

"আল্লাহ্ পাক একমাত্র শির্ক ব্যতীত আর সমস্ত গোনাহ্ যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন।" সূরা নিসা, ১১৬ আয়াত ;

কল্পনা পূজা ও সৃষ্ট জীবের পূজার হাত থেকে মানুষকে টেনে বের করবার জন্য যতখানি কোমল ব্যবহার করা দরকার করতে হবে। একটি গোটা শহর, একটি গোটা দেশকে হিকমতের সঙ্গেই কেবল আল্লাহ্র রাস্তায় নিয়ে আসা যেতে পারে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন শুনতে পেলেন যে, সা'দ বিন 'উবাদা (র.) আবু সুফিয়ানকে দেখে বলেছেন ঃ

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة اليوم

اذل الله قريشا ○

(আজ সংগ্রামের দিন, আজ কা'বা প্রাঙ্গণে অবাধে রক্ত বইয়ে দেবার দিন, আল্লাহ্ পাক আজ কুরায়শদেরকে অপমানিত করেছেন) অমনি তিনি বলে উঠলেন ঃ (না, সা'দ মিথ্যা বলেছে,)

اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريشا و يعظم

الله الكعبة ○

(আজ দয়া প্রদর্শনের দিন, আজ আল্লাহ্ কুরায়শদেরকে সম্মানিত করবেন এবং কা'বার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন) আর এই বলে তিনি সা'দ বিন উবাদা (রা)-এর ঝাণ্ডা কেড়ে নিয়ে তৎপুত্রের হাতে তুলে দিলেন। পিতার পরিবর্তে পুত্র ইসলামী ঝাণ্ডা বইবার গৌরব লাভ করলেন। এই কর্মকৌশল দৃষ্টে আবু সুফিয়ানের অন্তর রাজ্যে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। আঁ-হযরত (সা) যখন তার ঘরকে নিরাপদ বাসগৃহরূপে ঘোষণা দিলেন—তখন আবু সুফিয়ানের শত্রুতা প্রেম ও বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হ'ল। এর থেকেই হিকমতের পরিমাপ করুন। আবু সুফিয়ানকে যখন এবংবিধ সম্মানে সম্মানিত করা হ'ল তখন তার ঘৃণার আগুন নিভল এবং অন্তরের বদ্ধ দরজা খুলল। ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের বুযুর্গগণ যেপথ দিয়েই গেছেন তওহীদের তাবলীগ এবং শির্ক ও বিদ'আত পরহেয করবার ওয়াজ করতে করতে গেছেন, আমাদের সেই কাফেলা যেখানে দিয়েই অতিক্রম করেছেন সেখানেই তওহীদের বায়ু প্রবাহিত হয়েছে। হযরত সায়্যিদ আলী হামদানী, সায়্যিদ আবদুর রহমান বুলবুল শাহ প্রমুখ (র) কাশ্মীরের নয়নাভিরাম পুষ্পোদ্যান ও মনোমুগ্ধকর ঝর্ণার প্রাচুর্য এবং মন মাতানো সবুজ বৃক্ষ শোভিত উপত্যকার সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য আসেন নি ; বরং তাঁরা উষর ধূসর মরু ও পার্বত্য এলাকা, কাঁটা ও ঝোপঝাড়ে পূর্ণ প্রান্তর ও উপত্যকারাজি অতিক্রম করে কেবলমাত্র সত্যের কলেমা (কলেমা-ই-হক)-এর প্রচার ও প্রসার ব্যপদেশেই এসেছিলেন যার নতীজায় আপনারা কাশ্মীরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তওহীদের অনুসারী হিসেবে আজ দেখতে পাচ্ছেন। আমি এ কথাগুলোই আর একটু বিস্তৃতি সহকারে জামে মসজিদের বক্তৃতায় বলেছিলাম। পত্রিকায় বেরিয়েছে যে, আমি নাকি সমস্ত কাশ্মীরীদেরকেই মুশরিক বলেছি। ভাল, কোনরূপ বাছ-বিচার না করে এধরনের ঢালাও মন্তব্য করার কি অধিকার ছিল আর আমি মুসলমানদেরকে একবাক্যে কিভাবে কাফির বলতে পারি। আমার গোটা বক্তৃতাই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তওহীদের দাওয়াতে ভালবাসা সৃষ্টি করুন। যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ ও মতপার্থক্য রয়েছে—দাওয়াতের ভেতর সেসব টেনে আনবেন না। মত-পার্থক্যগত বিষয়ে কোন একটিকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেওয়া আলাদা ব্যাপার। জ্ঞানের জগতে মতভেদ ও মতপার্থক্যের সুযোগ সব সময়ই রয়েছে। এসব পরে দেখা যাবে। আমাদের পয়লা বিবেচ্য বিষয় হ'ল তওহীদ। আল্লাহ্‌র সামনে আমাদের মাথা নোয়াতে হবে। জ্ঞানগত ও পুঁথিগত মত-পার্থক্য এর পরবর্তী বিষয়। বুযুর্গদের কাজ হ'ল সর্বত্র তওহীদকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং শিরক ও বিদ'আত দূরীভূত করা। হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) তাঁর যুগের তরীকতের একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি ছিলেন হানাফী মযহাবের অনুসারী। একজন আহলে হাদীছ 'আলিম তাঁর হাতে বায়'আত ও মুরীদ হন এবং সালাতে রফা' য়াদায়ন (দুই হাত উঠান) পরিত্যাগ করেন। মওলানা বিষয়টি জানতে পেরে তাঁকে বল-লেন : আপনি যদি বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনার মত পাল্টে থাকেন এবং রফা' য়াদায়ন ছেড়ে থাকেন তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু তা না করে যদি আমার জন্য আপনি ছেড়ে থাকেন তাহলে (জেনে রাখুন) আমি আপ-নাকে একটি সুন্নত পরিত্যাগের জন্য বলতে পারি না।

আপনাকে দেখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র মাখলূক (সৃষ্ট জীব) কোথায় চলেছে? আর সবচে' বড় কথা হ'ল কুরআন ও হাদীছের তাবলীগ। আর এটাই দাওয়াত ও তাবলীগের মোদ্দা কথা হওয়া উচিত। মযহাবী বৈশিষ্ট্য এর পরের বিষয়। মুসলমান সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু দীনের জযবা ও প্রেরণা তা নেই যা পূর্বে ছিল। সাধারণ মুসলমানদের ওপর যদি কোন বিপদ দেখা দেয় তাহলে সবাই তার জন্য বুক পেতে দিন। খেয়াল রাখবেন কারো মনে আঘাত না লাগে, কেউ যেন কষ্ট না পায়। সব সময় উদার মন ও মানসিকতার প্রমাণ দিন। ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ ছড়াবেন না।

সাদিকপুরী ও গযনবী খান্দান ছিলেন উলামা-ই-আহলে হাদীছ। মওলানা বিলায়েত 'আলী, মওলানা আহমাদ উল্লাহ, মওলানা ইয়াহইয়া আলী, মওলানা আবদুর রহীম, মওলানা সায়্যিদ আবদুল্লাহ গযনবী, মওলানা আবদুল জব্বার গযনবীর মত দীনদার ও আল্লাহ্‌ প্রেমিক হযরত, যাঁদের চেহারা থেকে নূর ঝরে পড়ত, যাঁদের দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হ'ত; এসব খান্দানেরই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁরা সারা হিন্দুস্তান জুড়ে কিভাবে ওয়াজ-নসীহত ও হিকমত

কিংবা প্রয়োজন মুহূর্তে যুক্তি ও প্রমাণ-পঞ্জীর সাহায্যে লোকের ঈমান ও আকীদার সংশোধন করেছিলেন।

অমৃতসরে নদওয়ার জলসা হচ্ছিল। হিন্দুস্তানের প্রখ্যাত সব উলামায়ে কিরাম এতে শরীক ছিলেন। যুগটা ছিল আল্লামা শিবলী নু'মানী (র)-র। জনাব সদর ইয়ার জঙ্গ মওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানীর মুখে শুনেছি যে, সকালে মওলানা আবদুল জব্বার সাহেব গযনবীর দরসে কুর-আন হত। বেশীর ভাগ তিনি ফারসীতে দরস দিতেন। একবার মওলানা শিবলী শরীক হন এবং মওলানা শেরওয়ানীকে বলেন : যেসময় মওলানা আবদুল জব্বার আল্লাহ্‌র নাম নিতেন তখন দেহ ও মনের ভেতর এক ধরনের বিজলীবৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হত এবং দিল্ চাইত তাঁর কদম মুবারকের ওপর মস্তক রেখে দিই।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর খান্দান ছিল হিন্দুস্তানের ওপর এক বিরাট রহমতস্বরূপ। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রচলন ঘটিয়েছেন এবং শির্ক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন করেছেন। কুরআনুল করীম তরজমা করবার কারণে তাঁদের ভীষণ বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দারা কবে এবং কখন দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে হচকচিয়েছেন? এখান্দানেই শাহ আবদুল আযীয, শাহ আবদুল কাদির, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ ইসমাঈল, শাহ ইসহাক (র)-এর মত উলামা-ই রব্বানী ও মুজাহিদীনে ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন। মওলানা ইসমাঈল শহীদ (র)-এর কেবল একটি ওয়াজেই এক জলসায় বিশজনের মত দেহজীবি মহিলা নেককার ও সতী-সাধ্বী রমণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার কিতাব "কারওয়ানে ঈমান ও 'আযীমত' দেখুন।

বক্তৃতার শেষে জমঈয়তের প্রচার সম্পাদক সূফী মুহাম্মদ মুসলিম সাহেব ইকবালের যে কবিতা পাঠ করেছিলেন সেই কবিতার মাধ্যমে আমি আমার বক্তৃতার সমাপ্তি টানতে চাই। কেননা উক্ত কবিতার ভেতর বক্তৃতার রূহ এসে গেছে।

نگہ بلند، سخن دلنواز، جان پر سوز
یہی ہے رخت سفر، میر کارواں کیلئے

"উন্নত দৃষ্টি, চিত্তের আনন্দদায়ক ভাষা এবং হৃদয়োত্তাপ—এগুলো হ'ল সফরের উপকরণ কাফেলা সর্দারের জন্য।"

খোদায়ী সাহায্যের পূর্ব শর্ত এবং ইসলামের সাহায্যের সোজা রাস্তা

(১৯৮১ সালের ৪ঠা নভেম্বর রোজ বুধবার তারিখে বিকেল ৪ টায় আন-জুমান-ই-নুসরাতুল-ইসলাম হলে লেখকের সম্মানে যে বিদায়ী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়—উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রী-নগর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলিম-উলামা ও চিন্তাবিদের সম্মুখে নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করা হয়।)

বা'দ হামদ, সালাত ও খুতবা-ই-মাসনূনা!

জনাব সদ্‌রে আন্‌জুমান ও সদরে ইজলাস, উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ এবং প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী! শ্রীনগরে এক সপ্তাহর অবস্থান অদ্যকার এ অনুষ্ঠানে শেষ হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি যে, এটা কেবল এক বিরাট সুযোগই নয়, বরং রীতিমত এক মহাসুযোগ। আমি পৃথিবীর বেশীর ভাগ বড় বড় দেশেই গিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি এমনই এক হতভাগা মুসাফির যার ক্ষেত্রে ইকবালের এই কবিতাংশটি অত্যন্ত সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে ঃ

تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں

সফরে হোক বা ঘরে—কোথাও নেই এই পথিকের অবসর।

মুসলিম বিশ্বের যেখানেই আমি গিয়েছি, সেখান থেকে হাসি-খুশী ও পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে আসার পরিবর্তে এক রাশ চিন্তা নিয়ে ফিরে এসেছি। আমার ভাগ্যটাই এমনি। জানিনা এটা আমার বর্ধিত তীক্ষ্ণ অনুভূতির কারণে, নাকি এজন্যে যে, আমি যেখানেই যাই সেখানে আমি আমার ঐতিহাসিক অধ্যয়ন ভুলতে পারিনা বলে। ইসলামের ইতিহাসে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেসব আমার চোখের সামনে থাকে এবং সে সব থেকে যে ফলাফল বের করা যায় আমার মস্তিষ্ক তা থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পায় না। স্বয়ং কুরআন মজীদ তাদের নিন্দা করেছে যারা চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা সত্বেও তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না।

وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ٥

"আসমান ও যমীনে এমন বহু নিদর্শন রয়েছে যার পাশ দিয়ে লোকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় আর তা থেকে তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না।" সূরা য়ুসুফ, ১০৫ আয়াত ;

আমি নিজেকে অত্যন্ত খোশনসীব মনে করতাম যদি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানানো হ'ত এবং আপনাদের সন্তোষ ও শান্তি বাড়িয়ে দেওয়া যেত। আল্লাহ্ আপনাদেরকে যে সুন্দর ভূখণ্ড দান করেছেন, যে সম্পদ দিয়ে ভরে দিয়েছেন, যে সব প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনাদেরকে এখানে দান করেছেন, খুবই আনন্দের কথা হত যদি আমি আপনাদেরকে বলতে পারতাম যে, আপনাদেরকে এসবের জন্য মুবারকবাদ! আপনারা নিশ্চিত থাকুন, চিন্তার কোন কারণ নেই।

কিন্তু আমি তা বলতে পারলামনা। এর একটা বড় কারণ হ'ল কুরআন মজীদ সম্পর্কে আমার এক-আধটু পড়াশোনা। কুরআন মজীদ আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে পড়েছি যে, তা একটা জীবন্ত গ্রন্থ এবং সজীব চিত্র কিংবা দর্পণ যার ভেতর যে কেউ স্ব-স্ব চেহারা দেখতে পারেন। যে কোন জাতি-গোষ্ঠীও তার সুরত দেখতে পারেন, দেখতে পারেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, সাম্রাজ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্থান-পতনের পরিণতিও এ গ্রন্থের ভেতর। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ٥

"আমি তোমাদের নিকট এমন এক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যার ভেতর রয়েছে তোমাদের আলোচনা ; তারপরও কি তোমরা উপলব্ধি করবে না।" সূরা আল-আম্বিয়া—১০ আয়াত ;

ذكركم-এর তরজমা ও তফসীর করেছেন আরও অনেক মুফাস্‌সির عزكم ও شرفكم অর্থাৎ তোমাদের সম্মান ও তোমাদের মর্যাদা।

কিন্তু এর পরিবর্তিত অর্থ হবে এই যে, এর ভেতর তোমাদের আলোচনা রয়েছে অর্থাৎ فيه حديثكم ; মোটকথা, কুরআন মজীদে আমল, আমলের প্রতিদান ও বিনিময়ের বর্ণনা এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিদান ও প্রতিশোধের বিধান পুরোপুরি বিদ্যমান। কুরআন মজীদ পরিষ্কার ঘোষণা করেছে ঃ

ليس بامانيكم و لا امانى اهل الكتب ط من يعمل سوء يجز به ٥

"তোমাদের খেয়াল-খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হবে না। কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে।" সূরা নিসা, ১২৩ আয়াত।

"মুসলমানেরা! না তোমাদের উপর কিছু নির্ভরশীল ও সীমাবদ্ধ, আর না কিতাবীদের উপর (যাদের বড় বড় দাবী রয়েছে ---- আমাদের আইন-কানূন তুলনাহীন)। খোদায়ী কানুন হ'ল من يعمل سوء يجز به 'কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে।' কমযোরীর, অসতর্কতার, অলসতার, গাদ্দারী ও অবিশ্বস্ততার, বিশৃংখলার, মতভেদ ও মতানৈক্যের, কর্মহীনতার, বিত্ত ও সম্পদ পূজার, ক্ষমতা পূজার—সবার জন্য খোদার এখানে একই পরিণতি, একই প্রতিদান অপেক্ষা করছে যার ভেতর কোন ব্যতিক্রম, রেআয়েত কিংবা পক্ষপাতিত্ব নেই। একথা কুরআন মজীদে কোথাও প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্টভাবে এবং কোথাও পরোক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর ভেতর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর, সাম্রাজ্যের, বড় প্রবল পরাক্রমশালী শাসকদের আলোচনাও রয়েছে এবং দুর্বল লোকদের আলোচনাও রয়েছে এতে। এতে এ আয়াতও বর্তমান রয়েছে ঃ

و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض

و مغاربها التى بركنا فيها ط و تمت كلمت ربك

الحسنى على بنى اسرائيل لا بما صبروا ط و دمرنا

ما كان يصنع فرعون و قومه و كانوا يعرشون ٥

"যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হ'ত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হ'ল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি।" সূরা আ'রাফ, ১৩৭ আয়াত।

ঠিক এভাবেই অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

و نريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض

و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين - و نمكن لهم فى

الارض و نرى فرعون و هامن و جنودهما منهم ما كانوا

يحذرون ٥

"সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল আমি ইচ্ছা করলাম তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে, ইচ্ছা করলাম তাদেরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা সেই শ্রেণীটি থেকে ওরা আশংকা করত।" সূরা কাসাস, ৫-৬ আয়াত।

কুরআন মজীদ পৃথিবীর তাবত জাতিগোষ্ঠী, ঐতিহাসিক যুগ-যমানা, জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় এবং বিভিন্ন যিন্দেগীর নানা ধরন ও নানান কিসিমের একটি জীবন্ত চিত্র এবং প্রোজ্জ্বল স্বচ্ছ নির্মল দর্পণ। যার ইচ্ছা,— তা ব্যক্তিই হোক কিংবা ব্যক্তির সমষ্টি জাতিগোষ্ঠী—জামা'আত হোক

কিংবা আঞ্জুমান, বংশ কিংবা গোত্র—এর ভেতর স্বীয় চেহারা দেখে নিক এবং আপন স্থান নির্ধারণ করুক এবং নিজেদের সম্পর্কে তারা নিজেরাই ফয়সালা করে নিক যে, আমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করা হবে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কারো কোন বিশেষ সম্পর্ক কিংবা আত্মীয়তা নেই। তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন ঃ

و قالت اليهود و النصرى نحن ابنؤا الله و احباؤه ط

قل فلم يعذبكم بذنوبكم ط بل انتم بشر ممن خلق ٥

“য়াহূদী ও খৃস্টানেরা বলে, ‘আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়’; বল, ‘তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন! না, তোমরা মানুষ তাদের মত যাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন’।” সূরা মায়িদা, ১৮ আয়াত।

সরবে ও উচ্চস্বরে বলেছে, চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে যে, য়াহূদী ও খৃস্টানেরা বলে যে, আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। আমরা উন্নত সম্প্রদায়, আমরা সাধারণ মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর, আমরা আল্লাহ্‌র বংশধর, তাঁরই সন্তান, প্রিয় সন্তান। এর জওয়াবে আল্লাহ্ বলেন, তোমাদের কথা যদি সত্য হয় তাহলে আল্লাহ্‌র প্রচলিত বিধান তোমাদের ক্ষেত্রে কি করে চলছে? সে বিধান তোমাদেরকে এতটুকু পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন কিংবা খাতির করে না কেন? তোমরাও আর পাঁচজনের মতই সাধারণ মানুষ।

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ ও বন্ধুগণ!

আমি আপনাদের আন্তরিকতা ও ভালবাসা, আপনাদের প্রদত্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছি। আমি অকৃতজ্ঞ হতে চাই না। কিন্তু তার অর্থ এও মনে করি না যে, আমি আপনাদেরকে পরিতৃপ্ত করি এবং কিছু প্রশংসার ফুলঝুরি ছড়িয়ে চলে যাই। যখন কেউ কাউকে ভালবাসে তখন সে তার বন্ধুর বিপদ দেখলে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে, তার চেহারার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে, চেহারার কুঞ্চন কিংবা সামান্যতম ভাঁজও তার সজাগ চোখ এড়িয়ে যায় না। তার নাড়ির স্পন্দন দেখে। সব সময় তার চেহারার প্রতি লক্ষ্য রাখে, আল্লাহ্ না করুন, সেখানে কষ্ট কিংবা দুশ্চিন্তার কোন ছাপ তো নেই। আমি আপনাদের সামনে আরয করতে

চাই যে, আপনারা খুবই নাযুক যুগ অতিক্রম করছেন। এই বাস্তব অবস্থাটি তুলে ধরবার জন্য আঞ্জুমানে নুসরাতু'ল-ইসলাম থেকে উত্তম কোন প্লাটফরম আমি দেখছি না।—এতে ইসলামেরই সাহায্য করা হবে। আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ আমাদের দু'আ লাভের হকদার। তাঁরা আমাদের জন্য এমন একটি মারকায কায়েম করেছেন যেখানে বসে এবং যার মাধ্যমে আমরা ইসলামের সাহায্য করতে পারি। কিন্তু মনে রাখবেন, ইসলামের সাহায্য করার কাজটি খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং আপনাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি, কোন জামাত (দল), কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্ব, কোন সম্মানিত বুযুর্গ এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন না।

সুধীমণ্ডলী ও বন্ধুগণ!

হযরত 'আমর ইবনু'ল-'আস (রা) যখন মিসর জয় করেন তখন পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল উন্নতি ও বিকাশের উত্তুঙ্গে। সবুজ ও শ্যামলিমার দিক দিয়ে মিসর ছিল কাশ্মীরের অনুরূপ। হযরত 'আমর (রা) যে ভূখণ্ড জয় করেন তা সৌন্দর্য, খনিজ, পশু, ও মানবীয় সম্পদে ছিল ভরপুর। একজন বিজয়ী সেনানায়কের পক্ষে যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি পাবার কথা তিনি তা পান নি। কেননা তিনি তো রসূল করীম (সা)-এর সুহবত ও সাহচর্য পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। কুরআন মজীদের চিন্তা ও দূরদর্শিতা এবং নবী করীম (সা)-এর সাহচর্যের বরকত তাঁর চোখকেই নয়,—তাঁর মন ও মগজকেও করে ছিল আলোকিত। আল্লাহ্ পাক তাঁকে মু'মিনের অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন এবং ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি থেকে এক কদম বেশী সাহাবিয়াতের অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন। তিনি আরব মুসলমানদের লক্ষ্য করে যারা ছিল এদেশের বিজেতা ও শাসক—এমন একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন যা সোনালী আঁখরে লিখে রাখার মত। তিনি বলেছিলেন ঃ انتم في رباط دائم। দেখ এবং মনে রেখ, এখানকার উর্বর ভূখণ্ড, চিত্তাকর্ষক পরিবেশ ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্য, এখানকার সম্পদ ও সংস্কৃতি তোমাদেরকে যেন তার ভেতর ডুবিয়ে না ফেলে এবং তোমরা যেন এ ভূখণ্ডে হারিয়ে না যাও। তোমরা যেন নিজেকে খুঁজে পাও, বাস্তব ও প্রকৃত সত্য খুঁজে পাও। আর তা কি? তা হচ্ছে ঃ

انتم في رباط دائم। তোমরা সদাসর্বদা একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ঘাটির পাহারায় নিয়োজিত আছ। তোমরা এটা মনে কর না যে, তোমরা কিবতী-(মিসরের আদিম অধিবাসী কপ্ট সম্প্রদায়)দেরকে পরাজিত করেছ এবং

রোম-সাম্রাজ্যের সর্বোত্তম এলাকা তোমাদের কবজায় এসে গেছে। জযীরাতু'ল-আরব একেবারে কাছে এবং এখানে সার্বিক ব্যবস্থাপনা তোমরা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছ। এব্যাপারে তোমরা যেন প্রতারিত না হও। انتم فی رباط دائم তোমরা এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছ যে, চোখ বুজেছ কি মরেছ। এখানে সব সময় তোমাদেরকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। তোমরা একটি পয়গামের বার্তাবাহী। তোমরা একটি দাওয়াত নিয়ে এসেছ; তোমরা একটিসীরাত, একটি জীবনাদর্শ ও জীবন-চরিত নিয়ে এসেছ। যদি দাওয়াতের ক্ষেত্রে তোমরা কোনরূপ অলসতা কিংবা গাফিলতির আশ্রয় নাও তাহলে তোমরা মারা পড়বে। তোমরা যদি নিজেদের সীরাত ও জীবনাদর্শ হারিয়ে ফেল যা তোমরা আরব থেকে বয়ে এনেছিলে, যা তোমরা নবীর কোল থেকে এবং মারকায-ই-রিসালত মদীনা মুনাওয়ারা থেকে নিয়ে এসেছিলে তাহলে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হবে। যদি কখনো তোমরা মনে কর যে, রুটী-রাযী কামাই করবার জন্য তোমরা এখানে এসেছ, তোমরা এখানকার উর্বর ভূখণ্ড থেকে, এখানকার শ্যামল সবুজ সৌন্দর্যের সমারোহ থেকে লাভবান হতে এখানে এসেছ, তোমরা যদি এখানকার আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার মাঝে ডুবে যাও, আর তোমরা যদি এতটুকু অলসতার প্রশ্রয় দাও তবে তোমাদেরকে কেউ করুণা দেখাবেনা, তোমরা এখানে বাঁচতে পারবেনা।

আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যে কথা একজন আরব সৈনিক, যিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না—বলেছিলেন সেই একই কথা যা আজও প্রযোজ্য। আজ বড় বড় মুসলিম দেশগুলির ক্ষেত্রেও সেই সেই কথা যা প্রযোজ্য যে, انتم فی رباط دائم-এর যিম্মাদারী আপনার, এ দায়িত্ব প্রতিটি ব্যক্তির। যে মুহূর্তে আরব উপদ্বীপে (জযীরাতু'ল-আরবে) নও-মুসলিমদের ভেতর মুরতাদ হবার হিড়িক পড়ে গেল তখনও এ দায়িত্ব ছিল সবার। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, দায়িত্বানুভূতি সবার এক নয়। মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকে, আর এ পার্থক্যই একজন মানুষকে বড় করে তোলে এবং খ্যাতির শীর্ষে উন্নীত করে, চিরস্থায়ী ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। হযরত আবূ বকর (রা) তখন মুসলিম জাহানের খলীফা। তিনি গর্জে উঠলেন: اینقص الدین و انا حی দীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর আমি বেঁচে থাকব? না, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। কোন আপোষ নেই, সমঝোতা নেই। ধিক আমার জীবনে! যদি আমারই সামনে ইসলামী শরীয়তের উপর কাঁচি চালানো হয়, ইসলামের

অপরিহার্য অঙ্গ ও হুকুম-আহকাম (বিধি-বিধান)-কে কাট-ছাঁট করা হয় এই বলে যে, নামায ঠিক আছে বটে, হজ্জও পালন করা চলে, রোযা! আচ্ছা তাও না-হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু যাকাত! না, ওটা মানা যাবে না। এভাবে দীনের বিকৃতি সাধন করা হবে—আমারই জীবিতাবস্থায়! না, এ হতে পারে না। তাঁর ভেতর জিদ চাপল আর তারই প্রকাশ ঘটল উল্লিখিত ভাষায়। তিনি যুগের হাওয়া পাল্টে দিলেন, ইতিহাসের ধারা দিলেন বদলে। একজন মানুষের প্রখর ইসলামী চেতনাবোধ ও জিদ, একজন মানুষের দায়িত্বানুভূতি পর্বত প্রমাণ সমস্যার জটাজাল ছিন্নভিন্ন করে দিল। সে ইতিহাস বড় দীর্ঘ। রিদ্দার ঘটনা এবং তার বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সুরক্ষিত রয়েছে। এখানে যে কথাটি আসল তা হ'ল হযরত আবূ বকর (রা)-এর কথা: "আমি বেঁচে থাকব আর দীনের উপর আঘাত নেমে আসবে? তা হয় না, হতে পারে না।" রসূল আকরাম (সা)-এর কাছ থেকে যে অবস্থায় দীন আমি পেয়েছিলাম, সেই অবস্থায় দীন থাকবে। সেখান থেকে একটি শব্দের, একটি বর্ণেরও হেরফের হতে আমি দেব না! কার্যত তিনি তাই করে দেখিয়েছিলেন।

সুধীমণ্ডলী!

আপনারা 'উলামায়ে কিরাম, শিক্ষিত সম্প্রদায়, জাতির নেতৃস্থানীয় আপনারাই। আপনাদের ভেতর বড় বড় বক্তা ও বাগ্মী রয়েছেন, আপনারা বিভিন্ন আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেসবের স্তম্ভস্বরূপ। কাশ্মীরের আপনারা হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কসদৃশ। আপনাদের ফয়সালাই যে কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হিসাবে গণ্য হবে। আমার প্রথম কথা হ'ল, এই ভূখণ্ডে যেন ইসলাম কায়েম থাকে, আর এটা আপনাদের অপরিহার্য দায়িত্ব। কাল হাশরের ময়দানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তশরীফ আনবেন আর বরকতময় আল্লাহ্ বিচারাসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। রসূল (সা) আপনাদের পরিহিত কাপড়ের আঁচল কিংবা জামার কলার টেনে ধরে জিজ্ঞেস করবেন: আল্লাহ্ পাক এই ভূখণ্ডকে ইসলাম রূপ সম্পদ দানে ধন্য করেছিলেন। আওলিয়া-ই-কিরামেকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদেরকে বিপদের মাঝে ঠেলে দিয়ে ঐই উপত্যকায় এসে পৌঁছেন। আল্লাহ্র কালাম ও পয়গাম সেখানকার অধিবাসীদেরকে পৌঁছান। এরপর আমরা ইসলামের রোপিত এই চারাটিকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করে তুলি এবং শীঘ্রই তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। আর সেই বৃক্ষটি কয়েকশ'

বছর সবুজ শ্যামল ও ফলবান বৃক্ষের আকারে ছায়া বিস্তার করে চলে। হাজার হাজার মসজিদ নির্মিত হয়, শত শত মাদরাসা ও খানকাহ্ কায়েম হয়, জলীলু'ল-কদর উলামা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিছীন জন্ম লাভ করে। কিন্তু তোমাদের এতটুকু অলসতায় ও অসতর্কতায় অথবা তোমাদের অনৈক্য ও বিশৃংখলার কারণে কিংবা তোমাদের অদূরদর্শিতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির ফলে ইসলামের এই বসন্ত কানন শীতেল ঋতুর শিকার হ'ল।

আমি স্পেনে গিয়েছি। সেখানে থেকে অন্তরে এক বিরাট আঘাত নিয়ে ফিরে এসেছি। আল্লাহ্ই জানেন, কোন ভুলের কারণে সেই মানবপূর্ণ ভূখণ্ড আওলিয়া ও আইম্মায়ে কিরামের কেন্দ্র ইসলাম থেকে মাহ্রূম হয়ে গেল। ইকবালের ভাষায় আজ তার অবস্থা হ'ল এই ঃ

آہ کہ صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذان

"হায়! কয়েক শতাব্দী যাবত তোমার আকাশ-বাতাস পাহাড়-প্রান্তর আযান শূন্য।"

ইতিহাস আমাদের বলে, ভুল এবং ভুলের শাস্তির ভেতর পরিমিতিবোধ থাকা জরুরী নয়, জরুরী নয় আনুপাতিক হার থাকার। কখনো দেখা যায়, ভুল ছোট কিন্তু তার শাস্তির বহর হয় বেশ বিরাট। এর কারণ অন্য-বিধ হতে পারে। কতক সময় দেখা যায়, একটি ছোট সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছে আর তার পরিণতিতে ভুগতে হয়েছে এক বছর নয়--শত শত বছর ধরে। পৃথিবীর বহু জাতিগোষ্ঠী ও দল ভুল করেছে এবং কোন বিশেষ মুহূর্তে দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে, আর তার শাস্তি ভোগ করছে শতবর্ষব্যাপী। আপনারা স্পেনে ইসলামের অবনতির ইতিহাস এবং তার কারণগুলো খুঁজে দেখুন, আপনারা জানতে পারবেন যে, আরব গোত্রগুলোর পারস্প-রিক শত্রুতা, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও অনৈক্য অর্থাৎ, রবী'আ ও মুদার, 'আদনানী ও কাহতানী, হেজাযী ও য়ামানীদের মতানৈক্যই ছিল এর বড় কারণ। যারা স্পেনের ইসলাম ও মুসলমানদের অবনতির কারণগুলো পর্যালোচনা করেছেন তারা ব'লেছেন যে, এর বড় কারণ হ'ল, আদনান গোত্রের ও হেজাযী লোকেরা চাইত যে, স্পেনে ক্ষমতার বাগডোর থাকবে তাদের হাতে। তারা কখনো ইসলামের তবলীগ ও প্রচার-প্রসারের দিকে এতটুকু মনো-যোগ দেয় নি। তারা ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে সরে গেছে যেখান থেকে

মুসলিম রাষ্ট্র দূরপ্রতীচ্য (মরক্কো) ছিল নিকটবর্তী, উত্তর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা তারা করে নি। তারা নির্মাণ-শৈলী ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ও মেধা ব্যয় করেছে,--- কিন্তু ইসলামের দৃঢ়তা বিধানে এবং ইস-লামকে সেখানকার অধিবাসীদের অন্তর-রাজ্যে ঠাঁই করে দেবার এতটুকু প্রয়াস তারা নেয় নি। তারা আয়-যাহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, তারা আল-হামরা কেল্লা তৈরী করেছে, তারা কর্ডোভা মসজিদও বানিয়েছে, স্থাপত্য শিল্পে সারা বিশ্বে যার নমুনা মেলা ভার---। কিন্তু এর পরিবর্তে তাদের আশেপাশের লোকদেরকে ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত করে তোলার দরকার ছিল, জাবালু'ত-তারিক (জিব্রাল্টার)-এর দিকে পিছু হটবার পরিবর্তে দরকার ছিল সম্মুখে অগ্রসর হবার এবং য়ুরোপের দিকে অগ্রাভিযানের। কিন্তু তা না করে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি, সূক্ষ্ম শিল্পকলার পৃষ্ঠ-পোষকতা ও নির্মাণ-কর্মে লেগে গেল। কবিতা ও কাব্য-চর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ল। কোন কোন সময় ভুল খুব বড় ও সুদূরপ্রসারী পরিণাম ডেকে আনে। কখনো কোন জাতিগোষ্ঠী বিরাট বড় জুলুম করেছে। জুলুম দৃষ্টে যে কেউ বলত, পতনের আর বড় বেশী দেরী নেই, সিংহাসন গেল বলে। কিন্তু তা হয়নি। অথচ একজন বিধবার আর্তনাদ ও কাতর চীৎকার এবং একজন য়াতীমের যন্ত্রণা-কাতর ফরিয়াদ সাম্রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টির কারণ হয়েছে।

পয়লা কথা হ'ল, যে কোন মূল্য এখানে ইসলাম টিকিয়ে রাখতে হবে। এ আপনাদের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা আপনাদের জন্যও ভাল, মুসলিম বিশ্বের জন্যও ভাল আর ভাল হিন্দুস্তানের জন্যও। হিন্দুস্তানের অবস্থার দাবীও তাই যে, আপনারা আপনাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে টিকে থাকুন। হিন্দুস্তানে কেবল তখনই সত্যিকার ভার-সাম্য কায়েম হবে, দেশ তখনই সম্মান পাবে ও সুসংহতি লাভ করবে যখন এখানে আপনারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব পয়গাম, নিজেদের শান্তি-প্রিয়তা, মানবপ্রীতি, গঠনমূলক মানসিকতা ও মেধাগত যোগ্যতা নিয়ে বেঁচে থাকবেন। যখন কোন সমস্যা এসে দেখা দেবে তখন আপনাদের বিচার্য বিষয় হবে, এ ভূখণ্ডের ইসলামী জীবনবোধ ও বিশ্বাসের উপর এর কি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পড়বে। কেবল এই নয়, এখানকার ইসলামী সভ্যতা ও সমাজ জীবন এবং এখানকার ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো যেন টিকে থাকে তাও আপনাদের দেখতে হবে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হ'ল যা আমি দেখতে পাচ্ছি—তা হ'ল, আকীদার বিশুদ্ধতা রক্ষা অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে তওহীদী সম্পর্ক স্থাপন এবং তিনি ভিন্ন অপর কারুর সামনে মাথা নত না করবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ। এক্ষেত্রে যদি কোন প্রকার ঘাটতি ঘটে তাহলে আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও ঘাটতি দেখা দেবে। কুরআন মজীদে পরিষ্কার ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে উম্মাহ কিংবা যে সম্প্রদায়ের তওহীদী বিশ্বাসে পার্থক্য দেখা দেবে তার শক্তির মাঝেও পার্থক্য এসে দেখা দেবে। শক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হ'ল তওহীদী 'আকীদা-বিশ্বাস।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ط وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ط وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ○

"আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহ্র শরীক করেছে, যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নি। জাহান্নাম তাদের আবাস; কত নিকৃষ্ট জালিমদের আবাসস্থল!"—সূরা আল-ইমরান, ১৫১ আয়াত।

এবং আরও বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ط وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ○

"যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে—পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে; আর এই ভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।"—সূরা আ'রাফ, ১৫২ আয়াত।

শির্ক দুর্বলতার কারণ, সব সময় ছিল, হামেশা থাকবে। سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিয়েছেন। বিষের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য, বিষ-প্রতিষেধক (تِرْيَاق)-এর ভেতর রয়েছে আর এক ধরনের বৈশিষ্ট্য। পানির ভেতর রয়েছে একরূপ বৈশিষ্ট্য, আগুনের মধ্যে রয়েছে আর এক বৈশিষ্ট্য। আর তওহীদের মধ্যে রয়েছে শক্তি, নির্ভয় ও ভীতিহীনতার বৈশিষ্ট্য। এজন্যই সবচে' বড় প্রয়োজন আকাইদের বিশুদ্ধতার। আল্লাহ্র সঙ্গে ইবরাহীমী, মুহাম্মদী ও কুরআনী তা'লীম মুতাবিক তওহীদের সম্পর্ক সুস্থির করা দরকার। অতঃপর এ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। কারণ শয়তান সবসময় ওঁৎ পেতে থাকে আর সে সব সময় ও সুযোগ বুঝে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর চোর সেখানেই যায় যেখানে সম্পদ থাকে। আপনাদের কাছে তওহীদ ও ঈমানরূপী সম্পদ রয়েছে। সেজন্য আপনারা বিপদমুক্ত নন। যারা এ সম্পদ ও নেয়ামত থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য কোন বিপদ নেই। আল্লাহ্র ফযলে আপনাদের কাছে এ নেয়ামত রয়েছে। আপনারা এ সম্পদ বাইরে থেকেও পেয়েছেন, ভেতর থেকেও পেয়েছেন। সেই নেয়ামত এখন এ ভূখণ্ডের অখণ্ড অংশ পরিণত হয়ে গেছে, এখানকার ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়েছে, পরিণত হয়েছে এখানকার জীবনের অংশে। কিন্তু এজন্য নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত বোধ করা উচিত হবে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টিকে আমি ভয় পাই তাহল অনৈক্য ও বিশৃংখলা। এর ভেতরও আল্লাহ্ পাক দুর্বলতার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন ঃ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ط إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না; করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে; আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" —সূরা আনফাল, ৪৬ আয়াত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, দেখ, পরস্পরে তোমরা লড়াই-ঝগড়া কর না; অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে, তোমাদের অটুট সংহতি লোপ পাবে। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য নিঃসন্দেহে জীবনের আলামত এবং প্রয়োজন মাফিক এটা হওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলে প্রতিটি মহল্লায় এক-একটি পতাকা, প্রতিটি ঘরেঘরে এক-একটি ঝাণ্ডা, প্রতিটি জায়গায় এক একটি আঞ্জুমান হওয়া ঠিক নয়।

তৃতীয় কথা হ'ল এই যে, অধিকাংশ দুর্বলতার মধ্যে এবং আকছার ভুলের ভেতর যে জিনিষটি পাওয়া যায় তাহ'ল পার্থিব জগতের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা, সীমাতিরিক্ত সম্পদপ্রীতি। আমি কোন শেষ কথা বলছি না, কোন সাক্ষ্যও দিচ্ছি না। কিন্তু একথা অবশ্যই বলছি যে, দুনিয়ার ভালবাসা, টাকা-পয়সার প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণও অনেক বড় দুর্বলতার কারণ। যেখান থেকেই সম্পদ আসুক—আসতে দাও, যেভাবে আসে আসুক, যেভাবে মর্যাদা লাভ ঘটে ঘটুক, যে কোন উপায় ক্ষমতা লাভ করা যায়—তা করা যাক, যেভাবে পদোন্নতি ঘটে ঘটুক, পদ লাভের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করতে হয় হোক, এসব আমার চাই-ই, কোনক্রমেই তা হাতছাড়া হতে দেওয়া যাবে না, এ ধরনের মানসিকতা বড় মারাত্মক। আমি এর দ্বারা এবলছি না যে, এগুলো সামাজিক স্বার্থের অনুকূল অথবা প্রতিকূল। তবে একথা অবশ্যই বলব,—এগুলো ব্যধির এক বিরাট বড় আলামত, এগুলোকেও বেশ ভয় করা দরকার।

চতুর্থত, সংস্কৃতির খারাপ দিকগুলো, অপব্যয় ও অপচয়, প্রথাপূজা এবং এসবের প্রতি বাড়াবাড়ি, সীমাতিরিক্ততা, গর্ব ও অহংকার—কুরআনুল করীম যেগুলো شرف ও بطر শব্দে অভিহিত করেছে।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ -

"যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তার বিত্তশালী অধিবসীরা বলেছে, তোমরা যেসব সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।"—সূরা সাবা, ৩৪ আয়াত;

অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ج فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ط وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ -

"কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের দম্ভ করত! এগুলোই তো ওদের ঘরবাড়ী; ওদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।" সূরা কাসাস, ৫৮ আয়াত;

সংস্কৃতির অপব্যয়গুলো কমিয়ে দিন। এতদিন যেভাবে বিয়ে-শাদীতে হয়ে এসেছে, যেভাবে শাহী ঠাট-বাঁটের সঙ্গে এবং টাকা-পয়সা দেদার লুটিয়ে আসা হয়েছে, আর সেভাবে নয়। এখন আর তার সময় নেই। একটু চোখ খুলুন, সময়টাকে জানতে চেষ্টা করুন এবং দরিদ্র মানুষের কথা একটু ভাবুন যারা কপর্দকশূন্য।

আরেকটি বিষয় হ'ল এই যে, চরিত্রে দৃঢ়তা থাকতে হবে। মানুষ যেন পারদের মত না হয়ে যায় যার কোন সময় স্থিরতা নেই; কখনো এদিকে আবার কখনো ওদিকে, কোন কিছুতেই স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা নেই। জাতি-গোষ্ঠির জন্য এও এক বিরাট মারাত্মক ব্যাধি। আপন চরিত্র ও কর্মাদর্শে দৃঢ়তা ও সংহতি সৃষ্টি করুন। একথা সাধারণভাবে আমি সমস্ত ভারতীয় মুসলমানদেরকেই বলছি। আর কেবল অনারবদেরকেই বলছি না, আরবদেরকেও বলি। আলহ'ামদু লিল্লাহ্! যে সব বক্তৃতায় আমি আরবদেরকে সম্বোধন করেছি সেখানে এর সাক্ষ্য মিলবে। এসব বক্তৃতা একটি সংকলন গ্রন্থ হিসাবে العرب و الاسلام নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছে। সেখানে আপনারা তা দেখতে পারেন। এগুলো সাধারণ রোগ প্রাচ্যের, এশিয়ার বিশেষভাবে আমাদের মুসলমানদের।

তা আরেকটি জিনিষ হ'ল এই যে, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ হতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলা দূর করতে হবে, এক হতে হবে, এবং তৃতীয় কথা হ'ল, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও সম্পদ-প্রীতির উপর কিছুটা বাধা-নিষেধ আরোপ করা উচিত, এর মুখে লাগাম পরানো উচিত। হাদীছ শরীফে এসেছে, আর আমি মনে করি যে, মু'জিযাগুলোর মধ্যে এও এক মু'জিযা যেগুলো হাদীছাকারে এবং নবী করীম (সা)-এর ইরশাদ আকারে সুরক্ষিত, الدنيا رأس كل خطيئة "দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা সব পাপের মূল কেন্দ্রবিন্দু, সমস্ত ভ্রান্তির গোড়া।" আপনারা দেখতে পাবেন যে, অমুক দুঃখজনক ঘটনা কেন ঘটল? কেন সে বিশ্বাস-ঘাতকতা করল, গাদ্দারী করল? এ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল কেন? সে-এর সঙ্গে কেন হাত মেলাল? সে তার জাতিকে বিকিয়ে দিল কেন? কেন সে তার দেশকে বিকিয়ে দিল? কেনই বা বিকিয়ে দিল সে তার সচেতন বিবেককে? এসবের গোড়ায় যে উত্তর মিলবে এককথায় তা হ'ল দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা, এছাড়া আর কিছু নয়।

মুসলমানদের একটি সাধারণ দুর্বলতার দিকে আমি অঙ্গুলি সংকেত করতে চাই! এ দুর্বলতা কোন কোন এলাকায় (কতকগুলো বিশেষ কারণে) অধিক পরিমাণেই পাওয়া যায়। আর তা হ'ল প্রয়োজনাতিরিক্ত আবেগ ও আতিশয্য। এ দুর্বলতা যেখানে এবং যখনই ব্যাপকভাবে দেখা দেয় এবং দলীয় ও আঞ্চলিক স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় তা বড় বড় বিপদ ও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এর দ্বারা অসাধু উদ্দেশ্যবাদিরা অবৈধ ফায়দা লোটে। কতক নাদান দোস্তও অজ্ঞতাবশে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। ইতিহাসের কতকগুলো জাতির বিপর্যয় ও দুঃখ-কষ্টের কারণও ছিল এই আবেগাতিশয্য, উত্তেজনা প্রবণতা ও মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব গ্রহণ। জনৈক কবি ঠিকই বলেছেন ঃ

چو از قومے یکے بے دانشی کرد
نہ کہ راغزلے ماند نہ مہ را

কোন দলে কেউ যদি নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করে তবে এর পরিণাম থেকে কেউ রক্ষা পায় না।

অতঃপর এই নির্বুদ্ধিতা যদি দু'একজনের দ্বারা না হয়ে একটি বিরাট দল কিংবা জনসাধারণ কর্তৃক হয় তাহলে তা আরও ভয়াবহ, অপমানজনক

এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল ও পরিণতির কারণ হয়। এই বাস্তব সত্যকেই প্রখ্যাত ও বিজ্ঞ আরব কবি মুতানাব্বী তাঁর কবিতায় বর্ণনা করেছেন ঃ

وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جارمه العقاب

"যে ভুল কোন জাতির নির্বোধেরা করেছে, তার ফলে গমের সঙ্গে এর পোকাও পেষাই হয়ে গেছে---এবং ভুলের সঙ্গে জড়িত নয় এমন লোকদেরকেও সেই ভুলের মাশুল যোগাতে হয়েছে।"

যে সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠী দুনিয়ার বুকে বিরাট বড় কৃতিত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে অথবা ইতিহাসে যারা সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা কিংবা জনক হিসাবে অভিহিত হয়েছেন অথবা যারা সত্য-সুন্দর ধর্ম ও জীবন-দর্শনের পতাকা সমুন্নত করেছেন, স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবেই তারা সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল, বিবেচনাসম্পন্ন ও উদারচিত্ত এবং একই সঙ্গে বীর বাহাদুর ও আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত ছিলেন। আর প্রথম দিককার মুসলমানরা তো এর সর্বোত্তম নমুনা ছিলেন। আমি একবার এক মজলিসে বলেছিলাম ঃ আমি এই কেবলই যখন এই শহরে প্রবেশ করছিলাম তখন দেখতে পেলাম, ---আমার কারের সামনে একটি ট্যাংকার যাচ্ছে। ট্যাংকারের পেছনে পরিষ্কার গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে, Hihgly imflameable অর্থাৎ অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। আমি বললাম,---এটি পেট্রোলের পরিচয় জ্ঞাপক হতে পারে, বারূদের পরিচয় হতে পারে, কোন জ্বালানী পদার্থের পরিচয়ও হতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের পরিচয় তো হতে পারে না যে, সামান্য ছেঁদো কথায় জ্বলে উঠবে, হয়ে পড়বে উত্তেজিত এবং পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে কোনরূপ পরওয়া না করেই যা চাইবে করে বসবে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক কিংবা সামঞ্জস্য থাকবে না, সরিষার পাহাড় নির্মাণ করবে (যার কোন স্থায়িত্ব নেই) এবং দোস্ত-দুশমন, দোষী ও নির্দোষ, সবল-দুর্বল, শিশু ও বৃদ্ধের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না! আবেগাতিশয্যের ও ঝোঁকের মাতালে কিছু করে ফেলা এক ধরনের বিপদজনক ব্যাধি যার চিকিৎসা করা তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজন। আমাদের নেতৃবৃন্দ, দীনের দা'ঈ, তা'লীম ও তরবিয়ত, ইসলাহ ও তাবলীগের কাজ যাঁরা করছেন সত্বর তাদের এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।[১]

মহাত্মন!

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমার কাশ্মীর অবস্থান এবং আমার নগণ্য বক্তৃতার সমাপ্তি এমন একটি স্থানে এবং এমন একটি কেন্দ্র থেকে হচ্ছে

যেখানে ইসলামের সাহায্য ও সহায়তা করবার জন্য একটি সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত, আন্তরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে আল্লাহ্‌র এক একনিষ্ঠ বান্দা মওলানা রসূল শাহ ইসলামের সাহায্যের ভিত্তি রেখেছেন। আল্লাহ্ পাক রোপিত এই বৃক্ষকে কবুল করেছেন, ফলবান করেছেন এবং করেছেন ছায়াদার।

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ـ تُؤْتِي

أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ـ

"(সৎবাক্যের তুলনা) উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়—যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, যা প্রত্যেক মওসুমে তার ফল দান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।" সূরা ইবরাহীম, ২৪-২৫ আয়াত;

এ বৃক্ষ আগেও ফল দান করেছে এবং এখনও ফল দিচ্ছে আর আল্লাহ্‌র মঞ্জুর হলে আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাশা যে, ভবিষ্যতেও এ বৃক্ষ ফল দিতে থাকবে। এ'কে মযবুত করুন।

এই সঙ্গে আমি আমার বিনীত নিবেদন শেষ করছি। আশা করছি, আমার এ কথাগুলো আপনাদের মন ও মস্তিষ্কে অবশ্যই সংরক্ষিত থাকবে এবং সেসব লোকের স্মৃতিতে অবশ্যই থাকবে যারা এক্ষেত্রে কিছু করতে পারেন। তারা দুর্বলতার কারণগুলোর অপনোদন ঘটিয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য টেনে নামাতে ও তা ডেকে আনবার উপকরণ ও শর্তসমূহ পূরণ করতে এবং সে সব উপকরণ সংগ্রহের প্রয়াস নিন যাতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সাহায্য নেমে আসে।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ

ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ط وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُونَ ٥

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী—হবার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুক।" সূরা আল-'ইমরান, ১৬০ আয়াত;

এই কথাগুলোর সঙ্গে আমি আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের জন্য বিশেষ করে মওলানা মুহাম্মদ ফারূক, তাঁর সঙ্গী-সাথী বন্ধুবর্গ এবং উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আমার আন্তরিক শুকরিয়া জানাচ্ছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই দু'আ করছি, আর আপনারাও দু'আ করুন, আমার এই হাযিরার কোন একটি বাক্যও যেন কবুল হয়, আল্লাহ্‌র নিকট এখানকার কোন একটি পদক্ষেপও যেন কবুল হয়। এখানে যে সাত আট দিন কাটালাম, তার ভেতরকার আরাম-বিশ্রাম ও চলাফেরা, এর অতিবাহিত মুহূর্তগুলোর ভেতর থেকে কোন একটি জিনিষও যেন কবুল হয় এবং আমার এখানে আসা কতকটা হলেও যেন সার্থক হয়, কল্যাণকর হয় এবং আমি আমার এই উপস্থিতির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট যেন লজ্জিত না হই যে, আমি কি উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম আর কি করে আসলাম।

ইলমের স্থান ও মর্যাদা এবং আলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(নিম্নোক্ত ভাষণটি ১৯৮১ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে কাশ্মীর য়ুনিভারসিটির সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হয়েছিল। এ অনুষ্ঠানেই লেখককে সম্মানসূচক ডি. লিট ডিগ্রী প্রদান করা হয়।)

জনাব চ্যান্সেলর (বি. কে. নেহরু, গভর্ণর কাশ্মীর)! প্রো-চ্যান্সেলর (শেখ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ্, কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী)! ভাইস চ্যান্সেলর (ডঃ ওয়াহীদ উদ্দীন মালিক)! বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী, সুধীবৃন্দ ও মু'আয্‌যায হাযিরীন!

আমার বিশ্বাস যে, 'ইল্‌ম (জ্ঞান) একটি একক সত্তা যা ভাগ করা যায়না, করা যায় না বন্টন। একে প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকের ভেতর ভাগ করা ঠিক নয়। আল্লামা ইকবাল যেমন বলেছেন:

دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم

'ইল্‌ম তথা জ্ঞানকে আমি এমন এক সত্য মনে করি যা আল্লাহ্‌র সেই দীন যা কোন দেশ কিংবা জাতির মালিকানাধীন নয় আর এটা হওয়া উচিতও নয়। 'ইল্‌মের আধিক্যের মধ্যেও আমি একত্ব দেখতে পাই। সেই একত্ব হ'ল সত্যবাদিতা, সত্যানুসন্ধান, জ্ঞানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং তা পাবার আনন্দ। এতদসত্ত্বেও আমি জনাব চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলর এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যে, তাঁরা তাঁদের শিক্ষা বিষয়ক সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে এমন একজন লোককে বাছাই করেছেন যার সম্পর্ক প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমি জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন কোন ক্ষেত্রেই এ নীতির সমর্থক নই যে, যে তার য়ুনিফর্ম পরে আসবে সেই কেবল জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্যাবত্তার অধিকারী। আর এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, যার শরীরে এই য়ুনিফর্ম থাকবে না কিংবা নেই---তার সঙ্গে না কথা বলা যায়, আর না তার কথাই শোনা চলে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কাব্য ও সাহিত্যের ময়দানেও একই অবস্থা। যারা সাহিত্যের পসারী সাজিয়ে বসবে না, সেখানে সাহিত্যের সাইন-বোর্ড টাঙাবে না এবং আদবের (সাহিত্যের) য়ুনিফর্ম পরিধান করে সাহিত্য আসরে আসবে না, তারাই বে-আদব (অ-সাহিত্যিক)। সাধারণ গণমানুষ ঐসব জন্মগত কবি-সাহিত্যিকদের অপরাধ কখনো ক্ষমা করে নি যাদের দেহে সেই য়ুনিফর্ম দেখা যায় না কিংবা দুর্ভাগ্যজনকভাবে যাদের য়ুনিফর্মের ভাণ্ডার থেকে কোন য়ুনিফর্ম জোটে নি। আমি 'ইল্‌ম-এর পুনঃ স্বাস্থ্য লাভোম্মুখিতা এবং জ্ঞানের সজীবতার সমর্থক যার ভেতর আল্লাহ্‌র রাহনুমাঈ প্রতিটি যুগেই শামিল ছিল। যদি আন্তরিকতা থাকে, থাকে নিষ্ঠা, সত্যিকার কামনা---তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কার্পণ্যের কোন আশংকা নেই, তিনি অকৃপণ হস্তে দান করবেন।

মহাত্মন!

এরকম একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ বিদ্যাপীঠের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে যা, গগনস্পর্শী হিমালয় পর্বতের একটি শ্যামল-সবুজ সৌন্দর্য ঘেরা উপত্যকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে,---স্বতপ্রণোদিতভাবেই আমার সেই ঘটনা মনে আসছে যখন আরবের একটি শুষ্ক এলাকায় একটি পর্বতোপরি--যা না ছিল সমুন্নত আর

না ছিল শ্যামল-সবুজ[১]---প্রায় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল এবং যা কেবল মানবেতিহাসেই নয় বরং মানব জাতির ভাগ্যের উপর এমন এক গভীর ও চিরন্তন প্রভাব ফেলেছিল, ইতিহাসে যার নজীর মেলে না এবং যার সেই "লওহ ও কলম"-এর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যার উপর রয়েছে জ্ঞান ও সভ্যতার, গবেষণা ও পর্যালোচনার এবং সৃষ্টিশীল রচনার বুনিয়াদ এবং যা ব্যতিরেকে এই মহান শিক্ষায়তনের জন্মই হ'ত না, জন্ম হ'ত না এই বিস্তৃত গ্রন্থাগারের যার কারণে বিশ্বের সৌন্দর্য এবং জীবনের মূল্য ও কদর উপলব্ধ হচ্ছে। এর দ্বারা আমি প্রথম ওয়াহী অবতীর্ণ হবার ঘটনাকেই বোঝাতে চাইছি,---৬১০ খৃস্টাব্দের ৬ই আগস্টের কাছাকাছি সময়ে আরবের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর মক্কার নিকট-বর্তী হেরা গুহায় যে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল। তার শব্দগুলো ছিল এরূপ:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

"পড়, তোমার প্রভু প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন---সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক'[২] থেকে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহি-

---

১. আলোচক এখানে বলেছেন যে, সেই ভূখণ্ড শুষ্ক এবং সেই পাহাড় ছিল লতা-গুল্মহীন রুক্ষ, কিন্তু হাফীজ জলন্ধরী কি সুন্দরই না বলেছেন:

نہ یہاں پر گھاس اگتی ہے نہ یہاں پر پھول کھلتے ہیں
مگر اس سر زمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں

"এখানে ঘাস মাটি ভেদ করে না, ফুলের কলিও ফোটে না এখানে,
তথাপি আসমান নত শিরে এ ভূখণ্ডের সাথে মিলিত হয়।"

২. عَلَق - সংযুক্ত, ঝুলন্ত, রক্ত, রক্তপিণ্ড ইত্যাদি। তফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন রক্তপিণ্ড। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানীগণ মাতৃগর্ভে মনুষ্য ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বর্ণনায় বলেন যে, পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা গর্ভধারণের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে জরায়ু গাত্রে সংলগ্ন হয়ে পড়ে। এই সম্পৃক্তি না ঘটলে গর্ভধারণ স্থায়ী হয় না। এই কারণে বর্তমানে 'আলাক' শব্দের অনুবাদ করা হয় এমন কিছু যা লেগে থাকে।

মান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" সূরা 'আলাক, ১-৫ আয়াত ;

বিশ্বস্রষ্টা তাঁর ওয়াহীর এই প্রথম কিস্তিতে এবং রহমতের বারিধারার প্রথম ছিঁটায়ও এই মূল সত্যের ঘোষণা প্রদানকে বিলম্ব কিংবা মূলতবী করে দেওয়া হয় নি যে, 'ইল্‌ম তথা জ্ঞানের ভাগ, কলমের সঙ্গে সম্পর্কিত। হেরা গুহার সেই একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার মাঝে—যেখানে একজন নিরক্ষর নবী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে দুনিয়াবাসীর হেদায়েতের জন্য পয়গাম নিতে গিয়েছিলেন এবং যাঁর অবস্থা ছিল এই যে, যিনি কলম চালনা করবার শিক্ষা নিজে শেখেন নি, লেখাপড়া সম্পর্কে যিনি আদৌ অবগত ছিলেন না। দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও এর নজীর মিলবে কি? মহত্ত ও সমুন্নতির কল্পনাও কি ঠাঁই পাবে যে, এই নিরক্ষর নবীর উপর একটি অক্ষর-জ্ঞানহীন উম্মাহ্ এবং একটি লেখাপড়ার জ্ঞানশূন্য ভূখণ্ডের মাঝে (যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো দূরের কথা, অক্ষর পরিচয়েরও যেখানে আম প্রচলন ছিল না) প্রথম বার ওয়াহী নাযিল হচ্ছে 'ইকরা' দ্বারা—যিনি নিজে লেখাপড়া জানতেন না। তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হচ্ছে এবং এর ভেতর তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, 'পড়'। এর ভেতর তাঁকে ইঙ্গিতে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, আপনাকে যে 'উম্মাহ্' দেওয়া হচ্ছে তারা কেবল শিক্ষার্থীই হবে না, বরং তারা হবে 'জগদ্‌গুরু' ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদাতা। তারা হবে বিশ্বে জ্ঞানের প্রচারক। আপনার ভাগ্যে যে যুগ পড়েছে সে যুগ নিরক্ষরতার যুগ হবে না, সে বন্য-বর্বরতার যুগ হবে না, সে যুগ মূর্খতার যুগ হবে না, জ্ঞানের সঙ্গে দুশমনীর যুগও সেটা হবে না; সে যুগ হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ, হবে বুদ্ধিমত্তার যুগ, দর্শনের যুগ, নির্মাণের যুগ, মানুষকে ভালবাসার যুগ, সে যুগ হবে উন্নতি ও প্রগতির যুগ।

اقرأ باسم ربك الذى خلق (সেই প্রভু-প্রতিপালকের নামে পড় যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন)। সে যুগের বড় ভ্রান্তি ছিল এই যে, স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালকের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বিধায় জ্ঞান-বিজ্ঞান সোজা-সরল রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিল। সেই ছিন্ন সম্পর্ক এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যখন জ্ঞানকে স্মরণ করা হয়েছে, তাকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে তখন তারই সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারেও সতর্ক করা

হয়েছে যে, জ্ঞানের আরম্ভ ও উদ্বোধন হতে হবে "স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালক" (রব) নাম দিয়ে। আর তা এজন্য যে, মানুষের জ্ঞান—সেত আল্লাহ্‌রই দেয়া, আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি তা এবং তাঁরই নির্দেশনায় ও নির্দেশিত পথে এ জ্ঞান সমান্তরালভাবে ও ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নতি করতে পারে। এ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক ও বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা, যা আমাদের এ পৃথিবীবাসী নিজ কানে শুনেছিল, যা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। যদি তৎকালীন পৃথিবীর সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের দাওয়াত দেওয়া হ'ত যে, আপনারা অনুমান করুন, যে ওয়াহী নাযিল হতে যাচ্ছে তার সূচনা কোন্ বস্তুর মাধ্যমে হতে পারে? তার ভেতর কোন্ সে জিনিষ যাকে অগ্রাধিকার দান করা যেতে পারে? তবে সেক্ষেত্রে আমি যতটুকু বুঝি,—তাদের ভেতর একজন লোকও যারা সেই নিরক্ষর জাতি-গোষ্ঠী, তাদের মেযাজ ও মস্তিষ্ক সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল—একথা বলতে পারত না যে, তা 'পড়' শব্দ দ্বারা সূচনা করা হবে।

এ ছিল এক বিপ্লবাত্মক দাওয়াত যে, জ্ঞানের সফর শুরু করতে হবে সেই মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নির্দেশনাধীনে—আর তা এ জন্য যে, এ সফর বড় দীর্ঘ, জটিল ও বিপদ পরিপূর্ণ। এখানে দিনে-দুপুরে কাফেলা লুট হয়, পদে পদে ভীতিপূর্ণ গভীর খাদ রয়েছে এখানে, রয়েছে গভীর নদী, প্রতি পদে রয়েছে সাপ ও বিচ্ছু। এজন্য এ পথে চলতে গেলে এমন একজন পরিপূর্ণ 'রাহবর'-এর প্রয়োজন যিনি এ পথের গভীর খাদ-খন্দক, প্রতিটি চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। আর প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের পরিপূর্ণ রাহবর একমাত্র আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা,—কেবলমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য নয়। কেবলমাত্র গাড়ীর সঙ্গে ঘোড়া জুড়বার নাম যে জ্ঞান—তা মানুষের উদ্দেশ্য হতে পারে না। সে জ্ঞানও মানুষের উদ্দেশ্য হতে পারে না যদ্দ্বারা কেবল পুতুল খেলাই চলে। আর তাও কোন জ্ঞান নয় যা দিয়ে কেবল মানুষের মন ভোলানো যায়। একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেবার নাম জ্ঞান নয়, এক জাতির সঙ্গে অপর জাতিকে সংঘর্ষে জড়িয়ে দেবার নাম জ্ঞান নয়, কেবল উদর পূর্তি করা যায় কিভাবে তা শেখাবার নাম জ্ঞান নয়, যে জ্ঞান কেবল ভাষার ব্যবহার শেখায়—তাও কোন জ্ঞান নয়; বরং

اقرأ باسم ربك الذى خلق - خلق الانسان من علق - اقرأ

وربك الأكرم - الذي علم بالقلم - علم الإنسان ما لم يعلم -

"পড়, তোমার প্রতিপালক বড়ই মহিমান্বিত"; তিনি তোমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে, তোমাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে কিভাবে অজ্ঞ ও অপরিচিত থাকতে পারেন! اقرأ و ربك الأكرم الذي علم بالقلم—আপনারা কল্পনা করুন যে, মর্যাদা এর চেয়ে বেশী আর কে বৃদ্ধি করেছেন যে, হেরা গুহার সেই প্রথম ওয়াহীও কলমকে বিস্মৃত হয় নি। সেই কলম যা সম্ভবত হাজার খুঁজলেও মক্কার কোন ঘর থেকে বেরিয়ে আসত না। আপনি যদি তালাশে বের হতেন—জানা নেই, হয়তো কোন ওয়ারাকা বিন নওফল[1] অথবা কোন 'কাতিব'[2]-এর ঘরে পেতেন যিনি অনারব দেশ থেকে কিছুটা লেখা-পড়া শিখে এসেছেন।

এরপর এক বিরাট বিপ্লবাত্মক ও অবিনশ্বর মূল সত্য তুলে ধরেছেন যে, জ্ঞানের কোন শেষ নেই। علم الإنسان ما لم يعلم মানুষকে শিখিয়েছেন এমন জ্ঞান যা সে আগে জানত না। বিজ্ঞান কি? টেকনোলজি বা প্রযুক্তি বিদ্যা কি? মানুষ আজ চাঁদে যাচ্ছে। মহাশূন্য আমরা অতিক্রম করেছি। দুনিয়া আজ আমাদের মুঠোয়। এসব যদি علم الانسان ما لم يعلم-এর ভ্রুভঙ্গ ইঙ্গিত না হয় তাহলে তা আর কি হতে পারে?

মহাত্মন!

আপনারা আমাকে অনুমতি দিন জ্ঞানের উপত্যকার নগণ্য একজন মুসাফির হিসাবে কিছু পরামর্শ, কিছু অভিজ্ঞতার বিবরণ আপনাদের খেদমতে পেশ করি।

---

১. নবীযুগের একজন আরব মনীষী যিনি তওরাত ও ইনজীলের বিরাট আলিম ছিলেন এবং হিব্রু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন।

২. আরবে লেখা-পড়া জানা লোককে 'কাতিব' বলা হ'ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পয়লা কাজ হ'ল চরিত্র গঠন। 'ভার্সিটি এমন সব চরিত্র গড়ে তুলুক যা স্বীয় বিবেককে আল্লামা ইকবাল-এর ভাষায় এক মুঠো বালির বিনিময়ে বিকিয়ে না দেয়। আজকের দর্শন ও নীতিশাস্ত্র মনে করে যে, এ বাজারে সব কিছুর মূল্যই নিরূপিত ও নির্ধারিত রয়েছে। কোন জিনিস যদি স্বল্পমূল্যে খরিদ করা না যায় তাহলে বেশী দামে তা খরিদ করা হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সাফল্য ও সার্থকতা এই যে, সে চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখবে। সে এমন জ্ঞানী মানুষ সৃষ্টি করবে, যে কখনই তার বিবেক বিক্রয় করে না, করতে পারে না। দুনিয়ার কোন শক্তি, কোন ধ্বংসাত্মক ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী দর্শন, কোন ভ্রান্ত দাওয়াত ও আন্দোলন কোন মূল্যেই যেন তাকে খরিদ করতে না পারে। ইকবালের ভাষায় সে যেন বলতে পারে পরিপূর্ণ আস্থা ও গর্বের সঙ্গে—

کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں - غلام طغرل و سنجر نہیں میں

جہاں بینی مری فطرت ہے لیکن - کسی جمشید کا ساغر نہیں میں

দয়া তোমার, প্রতিভাশূন্য নই আমি, কোন তুগরিল ও সনজারের গোলাম নই আমি। পৃথিবী চষে বেড়ান আমার স্বভাব, তবে কোন জমশীদের খেদমতগার নই আমি।

দ্বিতীয় দায়িত্ব হ'ল এই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যেন এমন সব যুবক বের হয় যারা নিজেদের জীবন ন্যায় ও সত্যের জন্য এবং 'ইল্‌ম ও হেদায়েতের জন্য কুরবানী দিতে তৈরী থাকে—যারা কারুর জন্য ক্ষুধার্ত থাকতে যেন সেরূপ আনন্দ পায় যেমন আনন্দ পায় কেউ উদর পূর্তি করে খাবার ও ভোজনোৎসবের ভেতর। যাদের খুইয়ে দেবার ভেতর সেই তৃপ্তি লাভ ঘটে যা কোন সময় কোন বস্তু লাভের ভেতর ঘটে না। যারা নিজেদের যৌবনের সর্বোত্তম সামর্থ্য, মস্তিষ্কের সর্বোত্তম যোগ্যতা এবং নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোত্তম উপহার যদ্দারা তাদের ঝুলি ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে—মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ব্যয় করবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এটা দেখতে হবে যে, সেগুলো উন্নত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক কতটা সংখ্যক তৈরী করতে পারছে! আমি পরিষ্কারভাবে বলছি যে, এখন কোন দেশের কিংবা রাষ্ট্রের পক্ষে এতে গর্বের কিছু নেই

যে, সেখানে বহু বড় বড় ভার্সিটি রয়েছে। এ ধরনের সংকীর্ণতা এখন খুবই পুরনো হয়ে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে আগ্রহে, অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে, 'ইল্‌ম ও আখলাকের প্রসারের ক্ষেত্রে এবং অসৎকর্ম, বদ আখলাকী, বর্বরতা ও পশুত্ব, বিত্ত-সম্পদ ও শক্তি পূজাকে রুখবার জন্য কতজন মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে! আপন জাতিগোষ্ঠী আত্ম-সচেতন, সভ্য ও বিবেকবান জাতিগোষ্ঠী হিসাবে গড়বার জন্য কত সংখ্যক যুবক বর্তমান আছে—যারা নিজেদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও অগ্রগতি থেকে চক্ষু বন্ধ রেখে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদেরকে ওয়াক্‌ফ করে! প্রকৃত মাপকাঠি এই যে, কতজন যুবক এমন আছে যারা দুনিয়ার সমস্ত আরাম-আয়েশ ও উন্নতি থেকে নিজেদের চোখ ফিরিয়ে রেখে কোন নির্জন কোণে বসে জ্ঞানের চর্চা করছে, করছে গঠনমূলক কোন কাজ।

বাস্তব সত্য এই যে, সাহিত্য, কাব্য, সূক্ষ্ম শিল্প-চর্চা, বিজ্ঞান ও দর্শন, রচনা ও সংকলন—সব কিছুর উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, দেশ ও জাতির মধ্যে একটি নতুন জীবন ও প্রাণ-স্পন্দন সৃষ্টি হোক এবং তা যেন মরীচিকা কিংবা হঠাৎ করে জ্বলে ওঠা অগ্নিশিখার মত না হয়। এ মুহূর্তে আমি এ সত্যের একজন মুখপাত্র ডক্টর মুহম্মদ ইকবালের সেই কবিতা পাঠ করব যা তিনি—যদিও কোন সাহিত্যিক কিংবা কবিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—কিন্তু এতদসত্ত্বেও তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন সমভাবে সবার প্রতি প্রযোজ্য।

اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن -
جو شی کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے -
یہ ایک نفس یاد و نفس مثل شرر کیا
شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو -
جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا

হে দৃষ্টিমান, দৃষ্টিদক্ষতা আছে বটে তবে
কোন বিষয়ের গুঢ় তাৎপর্য না দেখতে পেলে সেই দৃষ্টিই বা কি লাভের?

উদ্দেশ্য হল চিরন্তন জীবনের জ্ঞান লাভ,
একটা বা দু'টো স্ফুলিঙ্গ কণা দিয়ে কি লাভ?

কবির কণ্ঠ হোক বা গায়কের আওয়াজ
বাগান যদি নির্জীব হয়ে পড়ে তবে ভোরের হাওয়ায় কি লাভ?

সুধীমণ্ডলী!

পরিশেষে আমি আমার সেসব ভাইদেরকে কিছু বলতে চাই যারা এখান থেকে সনদ নিয়ে যাচ্ছেন অথবা সেসব খোশনসীব বন্ধুদের যারা জ্ঞানের এই কুসুম কাননে বিনীত পদচারণায় মত্ত। আমি আমার কথা বলতে গিয়ে (যা কিছুটা নিরস এবং গম্ভীর প্রকৃতির হবে) একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীর আশ্রয় নেব যা সম্ভবত—আপনাদের কানের স্বাদ পরিবর্তনেও সাহায্য করবে।

কথিত আছে যে, একবার কতিপয় ছাত্র চিত্তবিনোদন ও খেলাধুলার নিমিত্তে একটি নৌকায় সওয়ার হয়। তারা ছিল আনন্দোৎফুল্ল। সময়টা ছিল সুন্দর ও আনন্দদায়ক। মৃদুমন্দ হিমেল বাতাস বইছিল। তেমন কোন কাজও ছিল না। অতএব এসব নবীন ছাত্র আর কতক্ষণই-বা নিশ্চুপ থাকতে পারে! মূর্খ মাঝি ছিল তাদের চিত্তাকর্ষণের বেশ ভাল মাধ্যম; বাক্য স্ফূর্তি ও হাসি-তামাশার জন্য ছিল অত্যন্ত উপযোগী। অনন্তর একজন চৌকশ ও বাকপটু তরুণ তাকে সম্বোধন করে বলল:

"চাচা মিঞা! আপনি লেখাপড়া কি শিখেছেন?"
উত্তরে মাঝি বলল, "জী! লেখাপড়া আমি কিছুই শিখি নি।"

ছেলেটি ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "আরে! আপনি বিজ্ঞান পড়েন নি?"
মাঝি বলল, "আমি তো ওর নামও শুনি নি!"

অপর একজন ছাত্র বলল, "জিওমেট্রি ও বীজগণিত সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই জানেন?"

মাঝি: এসব নাম আমি এই নতুন শুনলাম, হুযুর!

এবার তৃতীয় ছেলেটি ফোঁড়ন কাটল, "যাই হোক, আপনি ভূগোল ও ইতিহাস নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন?"

মাঝি বলল, "স্যার! আপনি শহরের নাম কইলেন, না কোন মানুষের নাম কইলেন, কিছুই বুঝলাম না!"

মাঝির এই উত্তরে ছেলেরা আর হাসি সম্বরণ করতে পারল না। তারা হো হো শব্দে হেসে উঠল। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করল,

"চাচা মিঞা! আপনার বয়স কত হবে?"

মাঝি ঃ এই বছর চল্লিশেক হবে।

ছেলেরা বলল, "আপনি আপনার জীবনের অর্ধেকটাই মাটি করলেন! কিছুই লেখাপড়া শিখলেন না?"

মাঝি বেচারা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগল এবং অপরাধীর মত নীরব রইল। এরপর মজা দেখুন! নৌকা কূল থেকে কিছু দূর অগ্রসর হতেই মেঘ ক্রমান্বয়ে ভারী হয়ে উঠল এবং ঝড় উঠল। নদীর বুকে শুরু হ'ল ঢেউ-এ ঢেউ-এ দাপাদাপি। সব কিছু গ্রাস করবার মতলব নিয়ে একটার পর একটা উত্তাল তরঙ্গ ছুটে আসতে লাগল। নৌকার তখন টাল-মাটাল অবস্থা। এই এখন ডোবে, তখন ডোবে—অবস্থা আর কি। নদীর বুকে ছেলেগুলোর এ ছিল পয়লা ভ্রমণ বিধায় এ ধরনের অভিজ্ঞতাও তাদের এই প্রথম। বাঁচবার সকল আশা-ভরসাই গেল তাদের খতম হয়ে। হতাশায় তাদের চেহারা গেল বিবর্ণ হয়ে। এবার মূর্খ মাঝির পালা। সে বেশ গম্ভীর স্বরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, "ভাইয়েরা! এবার তোমরা বল দেখি, কি কি লেখাপড়া তোমরা শিখেছ?" ছেলেগুলো কিন্তু এই সোজা সরল মাঝির প্রশ্ন আদৌ বুঝতে পারে নি। তারা স্কুল-কলেজে অধীত বিদ্যার এক লম্বা ফিরিস্তি পেশ করতে শুরু করল। ফিরিস্তি শেষ হতেই মাঝি মুচকি হেসে পুনরায় জিজ্ঞেস করল "ঠিক আছে. সব কিছুই তো পড়েছ, শিখেছও অনেক। কিন্তু সাঁতারটাও কি শিখেছ? আল্লাহ্ না করুন, যদি নৌকা ডুবে যায় তাহলে কূলে পৌঁছুবে কী করে?"

ছেলেদের ভেতর কেউই সাঁতার জানত না। তারা খুবই দুঃখের সঙ্গে জওয়াব দিল, "চাচাজান! এই একটা বিদ্যাই কেবল আমরা শিখি নি। এটাই কেবল আমাদের অজানা রয়ে গেছে।"

ছেলেদের উত্তরে মাঝি জোরে হেসে উঠল এবং বলল, "মিঞা! আমি তো আমার অর্ধেক জীবন খুইয়েছি,—কিন্তু তোমরা তো দেখছি জীবনের গোটাটাই বরবাদ করেছ। কেননা আজকের এই মহাতুফানে তোমাদের ঐ

লেখাপড়া কোনই কাজ দেবে না। আজ কেবল সাঁতার, হ্যাঁ, কেবল সাঁতার জ্ঞানই তোমাদের জীবন বাঁচাতে পারত। অথচ তাই তোমরা জান না!"[১]

আজও পৃথিবীর বড় বড় উন্নত দেশের যারা বাহ্যত দুনিয়ার কিসমতের মালিক সেজে বসে আছে—অবস্থা এই যে, জীবন নৌকা তাদের পানির উপর ভাসছে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ খুনী হাঙ্গরের ন্যায় মুখ ব্যাদান করে অগ্রসর হচ্ছে। উপকূলভাগ দূরে কিন্তু বিপদ নিকটবর্তী। নৌকার সম্মানিত ও যোগ্য আরোহীরা সব কিছুই জানে, জানে না কেবল নৌ-চালনা বিদ্যা এবং সন্তরণ জ্ঞান। অন্য কথায়, তারা সব কিছু শিখেছে, কিন্তু ভাল মানুষ, শরীফ ও ভদ্র, আল্লাহ্‌র পরিচয়ে পরিচিত, মানব দরদী ও মানব-প্রেমিক মানুষের মত জীবন যাপনের শাস্ত্রই কেবল সে শেখেনি। আল্লামা ইকবাল তাঁর কবিতায় এরূপ নাযুক অবস্থা এবং এই অত্যাশ্চর্য ও বিরল বৈপরীত্যের ছবি এঁকেছেন—বিংশ শতাব্দীর সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিই কেবল নয়, সমাজও যার শিকার।

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذرگاہوں کا -
اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا
اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا -
آج تک فیصلۂ نفع و ضرر نہ کر سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا -
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

"নক্ষত্রপুঞ্জের যাত্রাপথের অনুসন্ধানী, স্বীয় চিন্তার জগতে ভ্রমণ করতে পারল না;

"স্বীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল মার-প্যাঁচে এমনই আটকে গেছে যে, অদ্যাবধি সে লাভ-ক্ষতির ফয়সালা করতে পারলনা;

"যারা সূর্য-শিখাকেও বন্দী করেছিল, জীবনের অন্ধকার রাত্রি তারা অতিক্রম করতে পারল না।"

---

১. লেখকের منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

ভদ্রোচিত মনুষ্য জীবন অতিবাহিত করবার মৌলিক শাস্ত্র, আল্লাহ্-ভীতি, মানব প্রেম, আত্মসংযমের সাহস ও যোগ্যতা, ব্যক্তি স্বার্থের উপর সামাজিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দানের অভ্যাস, মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা, মানুষের জান-মাল ও ইযযত-আবরূ হেফাজত করবার প্রেরণা, অধিকার দানের দাবী উঠার সঙ্গে দায়িত্ব সম্পাদনের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান, কমযোর ও মজলুম মানুষের প্রতি সমর্থন ঘোষণা ও তাদের হেফাজত এবং জালিম ও সবলের সঙ্গে লড়াই-এ নামার উৎসাহ—সে সব মানুষের সঙ্গে যাদের নিকট বিত্তসম্পদ ও পদমর্যাদা ব্যতিরেকে আর কোন সম্পদ নেই, নিষ্কম্প ও ভীতিহীনতা সর্বক্ষেত্রে—এমনকি আপনজন ও আপন জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হলেও সত্য কথা বলার মত সাহসিকতা, আপন ও পরের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির পাল্লা আঁকড়ে ধরা, কোন বিজ্ঞ ও অদৃশ্য শক্তির তত্ত্বাবধানের প্রতিনিধিত্বে বিশ্বাস এবং তাঁর সামনে জওয়াবদিহির অনুভূতি ও হিসাব নিকাশের আশংকা,—এগুলোই সঠিক, মনোরম, নিরাপদ ও কামিয়াব যিন্দেগী অতিবাহিত করবার বুনিয়াদী শর্ত এবং একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ, একটি শক্তিশালী, নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সম্মানজনক রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রয়োজন ও তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এর শিক্ষা এবং এর জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বপ্রথম দায়িত্ব এবং এর অর্জন শিক্ষিত বংশধর ও রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণী ও মনীষীদের পয়লা কর্তব্য। আমাদেরকে এসকল ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের পূর্ণতা সাধনে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা সফল ও সার্থক এবং এর সনদপ্রাপ্ত সুধী ও মনীষীবৃন্দ কতটা মুবারকবাদের যোগ্য আর ভবিষ্যতে এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলে আমরা কিরূপ দৃঢ় সংকল্প এবং এজন্য আমরা কি ব্যবস্থার কথা ভেবে রেখেছি।

পরিশেষে আমি আবার আপনাদের সম্মান, আস্থা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রেরণার জন্য শুকরিয়া আদায় করছি যা আপনারা এ পদক্ষেপ গ্রহণের মাঝ দিয়ে প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

পাকিস্তানী ভাইদের উদ্দেশ্যে

১৯৭৮—সালের ৬ই জুলাই থেকে ২৮শ জুলাই পর্যন্ত প্রায় মাসব্যাপী পাকিস্তান সফরকালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে দেয়া সম্বর্ধনা সভায় মওলানা আবুল হাসান আলী নদভীর ভাষণ।

বিশ্ব মুসলিম কাফেলার মহান মুসাফির

(১৯৭৮ ইং-এর জুলাই মাসে পাকিস্তানের করাচীতে মক্কাভিত্তিক বিশ্ব ইসলামী সংস্থা রাবেতা আলম আল-ইসলামীর প্রথম এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সম্মেলনে ভারত থেকে আমন্ত্রিতদের অন্যতম ছিলেন মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী। সম্মেলন শেষে পাকিস্তান জাতীয় ঐক্যজোট (পি. এন. এ.)-র সেক্রেটারী জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী প্রফেসর আবদুল গফুর মাওলানার সম্মানে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাবেতা সম্মেলনে আগত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। এ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত মাওলানার সারগর্ভ ভাষণটি এখানে আমরা পাঠকবর্গের খিদমতে পেশ করছি)।

হৃদয় থেকে হৃদয়ে

হাম্‌দ ও সালাতের পর!

সুধীমণ্ডলী! মওসুমের অবিরাম বর্ষণ উপেক্ষা করে আজকের এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আস্থা ও ভালবাসার যে স্নিগ্ধ পরশ আপনারা আমাকে উপহার দিয়েছেন সেজন্য আপনাদের আন্তরিক মুবারকবাদ। মানুষের জীবনে কখনো এমন দুর্লভ মুহূর্তও আসে যখন হৃদয়ের উচ্ছসিত আবেগ ও ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য মনে হয় অপ্রতুল ও কিঞ্চিতকর। লেখার জগতে আমি নবাগত নই। বক্তৃতার মঞ্চেও অনভ্যস্ত নই। তবু আমাকে অসংকোচে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তে তেমনি এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে আমি আচ্ছন্ন। কেননা জাতির মেধা ও হৃদয় এখানে সমবেত।

সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্যাস এখানে উপস্থিত। আর তাদেরই সম্বোধন করে আমি কথা বলছি। এমন সময় ইচ্ছা হয় হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে যাক হৃদয়ের কাছে আর চলুক নিরব ভাববিনিময়। কিন্তু তা বুঝি সম্ভব নয়। কেননা মানুষের বিজ্ঞান আজো এতটা উন্নতি লাভ করেনি যাতে আমার আওয়াজের সাথে হৃদয়ের স্পন্দনও আপনাদের কাছে অর্থময় হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য সজীব হৃদয়ের অধিকারী আল্লাহ্ প্রেমিকদের পক্ষে তা অসম্ভব নয়।

এ ভাব-বিহবলতার কারণে হয়ত আমি আমার বক্তব্য সাজিয়ে গুছিয়ে আপনাদের সামনে পেশ করতে পারবনা। তবে আশা করি, হৃদয়ের দরদ ও আকুতি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারব।

প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভাষা নির্ধারণের ব্যাপারে গতকালও এমন বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলাম। ভাবছিলাম উর্দুকেই অগ্রাধিকার দেব। কেননা ইসলামী উম্মার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ ভাষা বোঝে ও এ ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সাথে সাথে বিবেক আমাকে সতর্ক করল। আমার নবী আমার কুরআনের ভাষা আরবীকে আমি কি কৈফিয়ত দেব। তাছাড়া রাবেতার দাফতরিক ভাষা হচ্ছে আরবী। আর রাবেতার মঞ্চে দাড়িয়েই আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। তাই দ্বিধাহীনচিত্তে আরবীকেই আমি বক্তৃতার ভাষা হিসাবে গ্রহণ করলাম। তবে সেই আরবী বক্তৃতার শুরুতে উর্দু কবিতার একটি পংক্তিও আমি উদ্ধৃত করেছিলাম। আপনাদের উপস্থিতি-ধন্য আজকের এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে দাড়িয়ে ইচ্ছা হয় সেই কবিতাটি অবার বলি।

লাখনৌর স্বনামধন্য কবি আমীর মিনাঈ কি সুন্দরই না বলেছেন ঃ

"আমীর! মজলিস গুলযার করে বন্ধুরা জড়ো হয়েছে। এই সুযোগে তুমি তোমার হৃদয়ের ব্যথা উজাড় করে দাও। এ প্রাণবন্ত মজলিস হয়ত আর পাবে না।"

উপস্থিত সুধীবৃন্দ! ঐশী জীবন-দর্শনের আলোকে দুনিয়ার বুকে ইনসাফ, শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জিহাদী পতাকাবাহী উম্মাহ হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ভাগ্য নির্ধারণের একটি নাযুক মুহূর্ত এসেছিল সেদিন যেদিন উছমানী সাল্তানাতের জীবন-মৃত্যুর ফয়সালা হতে যাচ্ছিল! মূলত উছমানী সাল্তানাতের ভাগ্য নির্ধারণের সাথে সাথে গোটা ইসলামী

রক্ষার জন্য তাহাদের প্রতি যে জিযিয়া কর ধার্য করা হইত, উহার সম্বন্ধেও তাঁহার আইনে গরীব অক্ষম যিম্মীর প্রতি কোন জিযিয়া কর ধার্য হইত না। মৃত ব্যক্তির জিযিয়া কর বাকী পড়িলে তাহা মাফ করিয়া দেওয়া হইত। যিম্মীগণের পারিবারিক আইন তাহাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী স্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাহাদের সামাজিক মামলা সেই অনুসারেই ফয়সালা করা হইত। কোন অগ্নিপূজক যদি নিজের মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইত তবে মুসলিম রাষ্ট্রের আইনে তাহা মানিয়া লওয়া হইত। তাহাদের সামাজিক ব্যাপারের মোকদ্দমায় তাহাদের সাক্ষ্য বিনা দ্বিধায় গৃহীত হইত। তাহাদিগকে এমন সমাজিক মর্যাদা দান করা হইয়াছিল যে, তাহারা মক্কা-মদীনা প্রভৃতি সম্মানিত শহরে ভ্রমণ করিতে পারিত, বিনা অনুমতিতে যে কোন মসজিদে প্রবেশ করিতে পারিত, নিজেদের ধর্ম মন্দির নির্মাণ করিতে পারিত। মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধকালে তাহারা যদি সৈনিক হিসাবে যোগদান করিতে চাহিত, তবে মুসলিম সেনাপতি নিঃসন্দেহে তাহাদের উপর আস্থা রাখিতে পারিতেন। হানাফী মযহাবের এই সকল আইন-কানুন খলীফা হারুন অর-রশীদের রাজত্বে সর্বাধিক প্রাধান্য পাইয়াছিল।

যিম্মীগণ মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দলবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্র করিলে শুধু সেই কারণেই মুসলমানগণের যিম্মী অর্থাৎ নিরাপত্তা দানের আওতা হইতে তাহারা বাহির হইয়া যাইবে। রাষ্ট্রদ্রোহ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যেমন জিযিয়া প্রদান না করা, কোন মুসলমান মেয়ের সাথে ব্যভিচার করা, কাফিরদের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তি করা, কোন মুসলমানকে কাফির হইবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা, আল্লাহ্ রসূলের প্রতি বে-আদবী প্রকাশ করা এ সকল অপরাধের দরুন তাহারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হইবে, কিন্তু যিম্মী হইতে খারিজ হইবে না।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-র মতে কোন মুসলমান ইচ্ছায় বা ভুলে বা অনিচ্ছায় কোন যিম্মীকে হত্যা করিলে হত্যার অপরাধী হইবে না। হত্যার বদলে ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে। সে ক্ষতিপূরণের পরিমাণও একজন মুসলমানের এক তৃতীয়াংশ। কোন ব্যবসায়ী যিম্মী পণ্য দ্রব্য যতবার এক শহর থেকে অন্য শহরে লইবে, প্রত্যেকবারের জন্য কর দিতে হইবে। তাহাদের প্রতি ধার্য্য জিযিয়া কর কোন অবস্থাতেই এক আশরাফীর

কম হইবে না। বৃদ্ধ, অন্ধ, গরীব কেহই তাহা মাফ পাইবে না। গরীবীর কারণে কোন যিম্মী জিযিয়া প্রদানে অসমর্থ হইলে তাহাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। তাহাদের উপর ধার্য্য ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু কমানো যাইবে না। কোন মোক-দ্দমায় দুই পক্ষই যিম্মি হইলেও কোন যিম্মীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে না। এ সকল মাস'আলায় ইমাম শাফিয়ী এবং ইমাম মালিক (রঃ) দুইজনই একমত। যিম্মীগণের হেরেম শরীফে প্রবেশের অধিকারী নহে। তাহাদের ধর্মীয় মন্দির নির্মাণের অধিকার নাই। তাহাদের প্রতি আস্থা রাখার হুকুম নাই। তাহাদিগকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করারও আইন নাই। কোন যিম্মী কোন মুসলমানকে হত্যা করিলে অথবা কোন মুসলমান নারীর সহিত যিনা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার যাবতীয় অধিকার বাতিল হইবে এবং সে যুদ্ধমান কাফির হিসাবে গণ্য হইবে। এ সব ব্যবস্থা শুধু ইহুদী খৃস্টানদের জন্য। তাহার মতে মূর্তিপূজকগণ জিযিয়া প্রদান করিয়াও ইসলামী রাজ্যে বাস করিতে পারিবে না।

এইসব ব্যবস্থার ফলে ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-র আইন কোন রাজ্যে চলে নাই। মিশর দেশে কিছুকাল তাঁহার আইন চালু ছিল, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে ইহুদী ও খৃস্টানগণ সর্বদাই বিদ্রোহ করিত।

এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হানাফী ফিকাহতে যিম্মীগণের প্রসঙ্গে কতকগুলি এমন আদেশও আছে যাহা কঠোর এবং সংকীর্ণতাপ্রসূত। সেগুলি এমনভাবে প্রচারিত হইয়াছে যেন উহা ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-র মাসায়েল। এজন্য অন্য জাতিও হানাফী মাস'আলা এমনকি দীন ইসলাম সম্বন্ধেও বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। হিদায়া নামক হানাফী ফিকাহ্ কিতাবে লিখিত আছে---"যিম্মীগণ হাতিয়ার বহন করিতে পারিবে না, তাহারা উপবীত ধারণ করিবে, তাহাদের গৃহের উপর এমন নিদর্শন রাখিতে হইবে যাহার দ্বারা বোঝা যায় তাহারা দ্বীন ইসলামের বাহিরে।" হিদায়া প্রণেতা এইসব আদেশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে "যিম্মীগণের মর্যাদা নীচু করিয়া রাখা প্রয়োজন।"

ফতওয়ায়ে আলমগিরীতে এর চাইতেও নির্দয় ও কঠোর হুকুম আছে। কিন্তু এসব ব্যবস্থাই পরবর্তী কালের ফকীহগণের আইন। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-র পোশাক এ সব ময়লা থেকে পরিস্কার।

পড়বে ছত্রভংগ। এই মুহূর্তে আপনাদের ভুল ও নির্ভুল উভয় সিদ্ধান্তেরই প্রভাব পড়বে উম্মাহর ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে। আপনাদের সামান্যতম বিচ্যুতি গোটা ইসলামী উম্মাহ্‌র ভাগ্য বিপর্যয় ঘটাতে পারে। একটি মাত্র ভুল সিদ্ধান্তই দু'এক শতাব্দীর জন্য উম্মাহ্‌র ভাগ্যের দুয়ারে ঝুলিয়ে দিতে পারে আরেকটি তালা, সেই সাথে হারিয়ে যেতে পারে সে তালা খোলার চাবি। উছমানী সালতানাতের বিলুপ্তির ফয়সালা ছিল তেমনি এক ভুল সিদ্ধান্ত। সুতরাং মনে রাখতে হবে, আপনারা আজ দাঁড়িয়ে আছেন এমন এক নাযুকতম স্থানে যেখানে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রয়োজন সর্বাধিক। দুঃখের বিষয়, রাজনীতির অংগনে কুরবানী (আত্মত্যাগ) শব্দটির এত বেশী অপব্যবহার ঘটেছে যে, বর্তমান শব্দটি তার অন্তর্নিহিত ভাব ও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। উম্মাহ্‌র জীবনে কুরবানী শব্দটি এক সময় ছিল শক্তি, আবেগ ও উদ্দীপনার এক অফুরন্ত উৎস। শ্রোতার দেহে অন্তরে একসময় তা শিহরণ জাগাত। রক্তের কণায় কণায় আগুন ধরিয়ে দিত। কিন্তু কোন সেবামূলক কাজে একদিনের বেতন দানের মত সাধারণ ক্ষেত্রেও আজ আমরা কুরবানী শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে কুরবানী এমন এক পূত-পবিত্র আমল যার স্রোতধারা বিলীন হয় ইবরাহিমী কুরবানীর সাগরগর্ভে গিয়ে। ইবরাহিমী কুরবানীর সাথেই হলো তার ঐতিহাসিক যোগসূত্র। প্রতিটি জিনিসেরই বংশ-সূত্র রয়েছে। মসজিদের বংশ-সূত্রের গোড়ায় রয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মিত আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা শরীফ। কাজেই যে মসজিদের বংশসূত্র ইবরাহিমী মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত নয় তা 'আল্লাহ্‌র ঘর' নাম পাওয়ার যোগ্য নয়, তা হলো মসজিদে যিরার, অকল্যাণের আঁখড়া। অনুরূপ যে বিদ্যাংগণের বংশ-সূত্র মসজিদে নববীর 'সুফ্‌ফার' সাথে সম্পৃক্ত নয় তা 'ইল্‌মের লালন ক্ষেত্র নয়, তা হলো অজ্ঞতা ও মূর্খতার উর্বরভূমি। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি বলতে চাই, যে কুরবানী ইবরাহীমী আবেগ ও প্রেম এবং ইসমাঈলী আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পনের স্নিগ্ধতামণ্ডিত নয়---তা কুরবানী নাম গ্রহনের যোগ্য নয়।

তিন প্রকার কুরবানী

উম্মাহ্‌র খিদমতে আপনাদেরকে আজ তিন প্রকার কুরবানী পেশ করতে হবে। আর প্রতিটি কুরবানীর জন্য আমাদের ইতিহাসে বিদ্যমান

রয়েছেন একেকজন আদর্শ পুরুষ। প্রথম কুররবানীর দৃষ্টান্ত হলো ইয়ারমুকের মাঠে বিজয় লাভের পূর্বমুহূর্তে সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের কুরবানী। দ্বিতীয় প্রকার কুরবানীর দৃষ্টান্ত হলো উম্মতের বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসনের মহান লক্ষ্যে হযরত মু'আবিয়া (রা)-র মুকাবিলায় হযরত হাসান (রা)-র অনুপম কুরবানী। তৃতীয় প্রকার কুরবানীর দৃষ্টান্ত হলো উম্মাহকে ইসলামী চরিত্র ও নৈতিকতার পথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে স্বজন ও পরিবারের স্বার্থ বিসর্জন এবং নিজের বিলাসী জীবনে বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে প্রদত্ত হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের কুরবানী। এই ত্রিমুখী কুরবানীই হলো পাকিস্তানের কাছে আজ ইসলামী উম্মাহ্‌র দাবী।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের কুরবানী আমাদের শিক্ষা দেয় যে, রণাংগণে বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তেও সেনাপতিকে বরখাস্ত করা হলে অম্লান বদনেই তাকে মেনে নিতে হবে সে নির্দেশ। বরখাস্তের মুহূর্তে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদের সেই অবিস্মরণীয় বক্তব্য অত্যন্ত গর্বের সাথে আজো ধারণ করে আছে ইসলামের সেনালী যুগের ইতিহাস। অকুঞ্চিত ললাটে স্বর্গীয় প্রশান্তি নিয়ে সেনাপতি হযরত খালিদ (রা) বলেছিলেন ঃ "আমার এ লড়াই ওমরের সন্তুষ্টির জন্য হলে এখন থেকে আর লড়বনা। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হলে ওমরের এ নির্দেশের কারণে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়বেনা আমার জিহাদী জযবায়।" অবাক বিস্ময়ে দুনিয়ার জাতিবর্গ প্রত্যক্ষ করল আল্লাহ্‌র এ সাচ্চা প্রেমিক বান্দা আল্লাহ্‌র জন্যই লড়েছিলেন। তাই তার জিহাদের গতি যেন হলো আরো তীব্র। শাহাদতের জযবা হলো আরো উদ্দীপ্ত। পৃথিবীর ইতিহাস কি এর কোন নজীর পেশ করতে পারে যে, যুদ্ধের ময়দানে যে সেনাপতির উপস্থিতিই ছিল বিজয়ের প্রতীক, যাঁর একেকটি নির্দেশ মুজাহিদদের মনে সৃষ্টি করত উদ্দীপনার নতুন জোয়ার, আল্লাহ্‌র রসূল যার মাথায় তুলে দিয়েছিলেন সায়ফুল্লাহ্‌র তাজ, তাঁর নামে ঠিক সেই মুহূর্তে মদীনা থেকে এলো বরখাস্তের ফরমান যখন তিনি ইয়ারমুকের মাঠে রোমকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে বিভোর। ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে মুজাহিদরা শুনল, এখন থেকে খালিদ ইবন ওয়ালীদ আর ফওজের সিপাহসালার নন। কিন্তু খালিদ ইবন ওয়ালীদের মনে কোন ভাবান্তর নেই। নতুন সেনাপতি হযরত আবূ উবায়দাকে দায়িত্বভার

বুঝিয়ে দিয়ে স্থির প্রত্যয়ের সাথে তিনি ঘোষণা করলেন---শাহাদতের আকাংখা নিয়ে সমান উদ্দীপনায় লড়াই করে যাবো আমি। কেননা আমার লড়াই আল্লাহ্‌র জন্য। অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসে বলীয়ান হযরত ওমরের মহান ব্যক্তিত্বের সামনেও ইতিহাসকে শ্রদ্ধাবনত হতে হয়েছে। আল্লাহ্‌র এ মহান বান্দা মুসলিম উম্মাহ্‌র অনাগত ভবিষ্যতের জন্য একটি উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপনের জন্য এমন বিপদসংকুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আমার মতে যুদ্ধের ইতিহাসে আর কখনো এমন ভয়ংকর ও ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ইসলামী উম্মাহ্‌র অন্তরে এ বিশ্বাস তিনি আরো দৃঢ়মূল করতে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্যই মুসলমানের বিজয়ের পূর্ব শর্ত। ব্যক্তির প্রশ্ন এখানে গৌণ।

জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিন

আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় আরেকটি কুরবানী হলো জাতীয় স্বার্থের মুকাবিলায় ব্যক্তি, দল ও শ্রেণী-স্বার্থকে বিসর্জন দান। এমনকি আমি এতদূর বলব যে, জাতীয় প্রয়োজনের নামে যে (অবাস্তব) পথ ও পন্থা আমরা গ্রহণ করেছি তার মুকাবিলায়ও (বাস্তব) জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা উম্মাহ্‌র কল্যাণের জনই দল ও জামাতের অস্তিত্ব অর্থাৎ উম্মাহ্‌র জন্যই দল, দলের জন্য উম্মাহ্ নয়। ভারতীয় জামাতে ইসলামীর আমীর মাওলানা ইউসুফ সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন। ভারতে মুসলিম পরামর্শ মজলিসের (مجلس مشاورت) প্লাটফরম থেকে বার বার আমি একথা বলেছি এবং এখনো আমি সেই একই বিশ্বাস পোষণ করি যে, উম্মাহর স্বার্থে প্রয়োজন হলে এক মুহূর্তে আমাদের সকলকে নিজ নিজ দলীয় ও শ্রেণীগত পরিচয় মুছে ফেলতে হবে এবং অন্যের অপেক্ষা না করে আমাকেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। খালিদ ইবন ওয়ালীদের জীবনেতিহাস আমাদের সে শিক্ষাই দেয়।

অনেক নামী-দামী ঐতিহাসিকও হযরত হাসান (রা)-এর কুরবানী ও আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তব বিচারে তা ছিল যে কোন আত্মত্যাগের তুলনায় মহীয়ান। তৎকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে নির্দ্বিধায় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত যে, হযরত হাসানের জন্য বিজয় ছিল শুধু সময়ের প্রশ্ন মাত্র। কেননা

তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম দৌহিত্র। হযরত আলীর হাজার হাজার অনুগামীর তরবারী তাঁর সপক্ষে ছিল খাপ-মুক্ত। এছাড়া মুসলিম উম্মাহর আবেগানুকূল্যও ছিল তাঁর অনুকূলে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মনোনীত খলীফায়ে রাশেদ। তাঁর হাতে বায়'আত অনুষ্ঠানও যথারীতি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেখলেন, বর্তমান পরিস্থিতি উম্মাহর জন্য কল্যাণকর নয়, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই মহান পিতার অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় হয়ে গেছে শুধু গোলযোগ দমনের পিছনে। তাই মুহূর্ত কাল বিলম্ব না করে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। পক্ষান্তরে কুরবানীর ইতিহাসে তাঁরই প্রিয়তম অনুজ হযরত হুসায়নের কর্মকাণ্ডও ছিল এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁরও ছিল স্বতন্ত্র ইজতিহাদ। আমার মতে উভয় ইজতিহাদই ছিল নির্ভুল ও বাস্তবোচিত।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় উভয়ের ইজতিহাদে কোন বৈপরীত্য নেই। ঐতি-হাসিক কার্যকারণ বর্ণনার এটা উপযুক্ত স্থান নয়। তবু আমি জোর দিয়েই একথা বলব, সময় ও পরিস্থিতি পরিবর্তনে সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন অপ-রিহার্য এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির বিচারে উভয়ের সিদ্ধান্তই ছিলো নির্ভুল। ঈমান ও ইখলাসের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলায় তাঁরা উভয়ে ছিলেন অকুতোভয়। মুহূর্তের জন্যও একথা আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত নই যে, দুর্বলতা কিংবা চাপের মুখে হযরত হাসান খেলাফত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তো স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন।

"আমার এ পুত্র নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন। হয়তবা---আল্লাহ্ পাক তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুই বিবদমান দলের মাঝে সন্ধি করিয়ে দেবেন।" বুখারী ;

এবার শুনুন হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীযের আত্মত্যাগ ও কুর-বানীর কথা। রাজপরিবারের তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সদস্য। মদীনা অঞ্চলের প্রশাসক থাকাকালে তাঁর উন্নত রুচিশীলতা, কেতাদুরস্ত চালচলন ও পোশাক-পরিচ্ছদ مشية العمرية বা 'ওমর স্টাইল' নামে অভিজাত মহলে ছিল সুপরিচিত। যুব সমাজে ওমর স্টাইলের ছিল সযত্ন চর্চা। বাজারের সেরা কাপড়ও এই বলে তিনি ফিরিয়ে দিতেন যে, এমন খসখসে কাপড় পরা সম্ভব নয়। কিন্তু খেলাফতের গুরুভার অর্পিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর জীবন ও

চরিত্রে দেখা দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এক জরুরী নির্দেশ বলে নিজের ও স্বজন-দের যাবতীয় জায়গীর ফিরিয়ে দিলেন বায়তুল মালে। বাজার থেকে একবার সবচেয়ে সস্তা কাপড় খরিদ করা হল, কিন্তু তাও তিনি ফিরিয়ে দিলেন এই বলে যে, অত দামী কাপড় পরা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। এই অভাবনীয় পরিবর্তন দেখে তাঁর বিলাসী জীবনের খাদেম কেঁদে ফেলল। তার মনে পড়ল সেদিনের কথা যেদিন সবচেয়ে দামী কাপড়ও তাঁর রুচি বিচারে নিম্নমানের বলে সাব্যস্ত হয়েছিল। ঝুপড়ীবাসী কোন দরবেশের পক্ষেও কল্পনা করা সম্ভব নয় এমনি সাধারণ পর্যায়ে নেমে এসেছিল তাঁর জীবনযাত্রার মান। সরকারী সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর সর্তকতার অবস্থা ছিল এই যে, একবার জনৈক সাক্ষাতকারী আলোচনার ফাঁকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা শুরু করতেই তিনি সরকারী বাতি নিভিয়ে দিয়ে ব্যক্তিগত কুপি আনিয়ে নিলেন। কেননা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সরকারী বাতি ও তেল ব্যবহার তাঁর মতে ছিল অন্যায়। এখানে কয়েকটি মাত্র নমুনা পেশ করা হলো। মূলত খেলাফত পরবর্তী তাঁর গোটা জীবনই ছিল ত্যাগ ও কুরবানীর অত্যুজ্জ্বল আর্দশ। এ মহান আদর্শেই আজ অনুপ্রাণিত হতে হবে পাকিস্তানের প্রতিটি ঈমান-দার ও বিবেকবান ব্যক্তিকে।

ইসলামী উম্মাহর ভাগ্য নির্ধারণের প্রশ্ন ঃ

জানিনা এটা আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য, আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ না কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা। তবু আমি উপস্থিত সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেই বলব---এ সভায় এমন কেউ নেই যিনি আমার মত এত বেশি এবং এত নিকট থেকে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। এটা আমার জন্য যেমন সৌভাগ্য, তেমনি দুর্ভাগ্যও বটে। সৌভাগ্য এজন্য যে, আমি আমার দেহের সবকটি অংগ-প্রত্যংগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়েছি। পক্ষান্তরে দুর্ভাগ্য এজন্য যে, আমার দেখা ইসলামী বিশ্ব আমার হৃদয়ের অন্তঃপ্রদেশে সৃষ্টি করেছে এক সুগভীর ক্ষত, আর প্রতিনিয়ত সেখান থেকে ক্ষরণ হচ্ছে টাটকা লাল রক্তের।

আমার দীর্ঘ জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ও অধ্যয়নের নির্যাস হিসেবে বলছি, আজ প্রশ্ন দল, সংগঠন ও ক্ষুদ্র স্বার্থের নয়, আজ প্রশ্ন হলো ইসলামী উম্মাহর জীবন-মরণের, ভবিষ্যত ভাগ্য নির্ধারণের। হতে পারে

ইবাদতসমূহের বাহ্যাকৃতি আজো অবিকৃত আছে। আদান-প্রদান ও লেনদেন সম্পর্কিত বেশ কিছু বিধি-বিধান আজো পালিত হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিশ্ব রাজনীতির পাল্লায় ইসলামী উম্মাহ আজ কোন ভার সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। বায়তুল মুক্কাদ্দাস, ফিলিস্তীন, লেবানন ও তুর্কী সাইপ্রাসসহ দেশে দেশে ঝরছে মুসলিম রক্ত। দলিত লুন্ঠিত হচ্ছে আমাদের অধিকার, আমাদের সম্পদ। অথচ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে প্রতিবাদে গর্জে উঠার সাহসটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে আমাদের। উছমানী সালতানাতের মর্মান্তিক বিলুপ্তির পর ইসলামী উম্মাহর কোন দেশ, গোষ্ঠী বা শাসক পরিবারই ইসলামী উম্মাহর কোন ইস্যুর উপর স্বাধীন মতামত পেশ করার এবং তা বাস্তবায়িত করার মত রাজনৈতিক অবস্থানে উপনীত হতে পারেনি। মরহুম ফয়সল অবশ্য কিছুটা সাহস দেখিয়েছিলেন। "কিন্তু সে পেয়ালা গেছে ভেঙ্গে আর সাকীও হয়েছেন গত।" ইসলামী বিশ্বে আজ এমন একটি দেশও নেই যার অসমর্থন, অসন্তুষ্টি কিংবা প্রতিবাদ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বৃহৎশক্তিকে মুহূর্তের জন্য হলেও দ্বিধান্বিত করতে পারে। আপনারা ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে পরিস্থিতির মুকাবিলা করুন। হিম্মত ও নির্ভীকতার সাথে সময়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন সাহায্য প্রদত্ত হলে তার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করুন। যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হলে দল ও মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাকে এগিয়ে যাওয়ার এবং জাতীয় অংগনে অবদান রাখার সুযোগ দিন। এটাই ঈমান, ইখলাস ও দেশপ্রেমের দাবী। মুসলিম উম্মাহর এ ভাগ্যরেখাগুলো সামনে রাখুন, এগুলো নিছক দেয়ালের লিখন নয়---তকদীরের সিদ্ধান্তমালা। আপনার সামান্য ভ্রান্তি-বিচ্যুতি, ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা, আঞ্চলিকতা, ভাষাভিত্তিক কিংবা শ্রেণীভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার মত ঘৃণ্য মানসিকতা ইসলামী উম্মাহর জন্য বয়ে আনতে পারে ধ্বংসের ঝড়। আমি আবার বলছি, জাতীয় স্বার্থকে সব স্বার্থের ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দৃষ্টিকারী ক্ষেত্রগুলো সযত্নে এড়িয়ে চলুন। প্রয়োজনে বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো কিছু দিনের জন্য হলেও বাক্সবন্দী করে রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় আলোচনা উসকে দিয়ে কাদা-ছোঁড়া-ছুঁড়ির অর্থ হলো আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করা। আমার স্থির বিশ্বাস, দু-একটি ধর্মীয় সংগঠন তাদের জন্মলগ্ন থেকে এই সর্তকতা অবলম্বন করলে তাদের চলার পথ আজ এতটা কন্টকাকীর্ণ হতোনা। পদে পদে তাদের আন্দোলন হতোনা ক্ষতিগ্রস্ত। তবে এও ঠিক, কোন মানবীয় প্রচেষ্টাই

ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আর মানুষ তার 'ইল্‌ম ও 'আকল তথা জ্ঞান ও বুদ্ধির গণ্ডিতেই আবর্তিত হয়ে থাকে।

প্রয়োজন এক মু'তাসিমের

আমি আশা করি আমার বক্তব্যের অর্ন্তনিহিত মর্ম অপনারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এতটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্‌র কাছে আমার আকুল প্রার্থনা, ইসলামী বিশ্ব এবং বিশ্বমানবতার জন্য আপনারা হবেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত; ন্যায়, ইনসাফ, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পৃষ্ঠপোষক। আপনারা হবেন ঈমান ও নৈতিকতার সেই মহাবলে বলীয়ান যা বাতিলের বিষ দাঁত দেবে ভেঙে। পৃথিবীর কোন সুদূর অঞ্চলের কোন অত্যাচারীর সাহস হবেনা জুলুম অত্যাচারের-থাবা বিস্তার করতে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় শত্রুর হাতে নির্যাতিতা মুসলিম মহিলার আর্ত চিৎকার وامعتصماه (কোথায় খলীফা মু'তাসিম) শুনে বাগদাদ থেকে ঝড়ের বেগে খলীফা মু'তাসিম ছুটে এসেছিলেন মজলুমের সাহায্যে। আজকের ইসলামী বিশ্বের বড় প্রয়োজন তেমনি এক শার্দুল মু'তাসিমের, নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর আর্ত-চিৎকার শুনে ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে যে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর উপর। সেই সিংহপ্রাণ মু'তাসিমের অপেক্ষায়-ই প্রহর গুণছে ক্ষতবিক্ষত মুমূর্ষ ইসলামী জাহান। জানিনা, আপনাদের মধ্যেই হয়ত ঘুমিয়ে আছে সেই মু'তাসিম। আপনারা জেগে উঠুন। কা'বা ঘরের জন্য যেমন প্রয়োজন একজন সম্মানিত ইমামের, শরীয়তের জন্য যেমন প্রয়োজন প্রজ্ঞাবান 'আলিমের, ইসলামী বিশ্বের জন্য ঠিক তেমনি প্রয়োজন সত্যপন্থী, ন্যায়প্রেমিক ও মানবদরদী এক জামাতের, যাদের পুণ্য স্পর্শে ইসলামী জাহান আবার ফিরে পাবে প্রাণ। এপর্যন্তই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের সকলকে এই কষ্ট স্বীকারের জন্য ধন্যবাদ। প্রফেসর আবদুল গফুর সাহেবের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি এই সুন্দর সুযোগটুকু আমাকে দিয়েছেন। আমি নিজে কিংবা আমার পাকিস্তানী বন্ধুমহল চেষ্টা করেও হয়ত এত সহজে এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হতোনা। আল্লাহ্‌ পাক সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

জাতীয় ঐক্য ও দাবী

(হামর্দদ ন্যাশনাল ফাউণ্ডেশনের সভাপতি হাকীম মুহাম্মদ সা'ঈদ সাহেবের উদ্যোগে করাচী ইন্টারকন হোটেলে ১৩ই জুলাই অনুষ্ঠিত 'হামর্দদ সন্ধ্যায়' প্রদত্ত ভাষণ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হাকীম মুহাম্মদ সা'ঈদ সাহেব পরিচিতিমূলক স্বাগত ভাষণ দান করেন এবং অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাবেতার সদস্য মাওলানা জামাল মিঞা সাহেব। উক্ত মাজিত সুধী মাহফিলে সমাজের সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। আগ্রহী শ্রোতাদের একাংশ এ বক্তৃতা শোনার জন্য দূরদূরান্ত সফর করে এসেছিলেন)।

হামদ ও সালাতের পর!

ঐক্য শব্দের আকর্ষণ শক্তি

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী! মান্যবর হাকীম মুহাম্মদ সা'ঈদ সাহেবের প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কেননা তিনি আমাকে এক মনোরম পরিবেশে, মাজিত সমাবেশে কথা বলার এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন। এক নবাগতকে (যার অবস্থানের মেয়াদ খুবই সীমিত এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে যার পরিচয়ের সূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ) সেদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নির্বাচিত এই সমাবেশে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া বাস্ত-বিকই একটা বড় ধরণের অনুগ্রহ। অবশ্য ভাব ও ভাবনার উচ্ছাস, আবেগের উদ্বেলতা এবং কৃতজ্ঞচিত্তের বিহ্বলতার মাঝেও আমার এ অনুভূতি রয়েছে যে, এ সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা আগন্তুক মেহমানের পবিত্রতম দায়িত্ব। আল্লাহ্ আমাকে সে তাওফীক দান করুন।

বক্তৃতার বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাকীম সাহেব যে প্রজ্ঞা ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা না করে উপায় নেই। দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ, পারস্প-রিক ভুল বোঝাবুঝি ও সন্দেহ-অবিশ্বাসের কুয়াশায় আচ্ছন্ন এবং সমস্যার হাজারো কাঁটাবন পাড়ি দিয়ে নতুন সমস্যার আবর্তে নিক্ষিপ্ত একটি দেশের ভবিষ্যত পথ-নির্দেশনার জন্য এমন একটি বিষয় নির্বাচন সত্যি প্রশংসনীয় প্রজ্ঞা ও বাস্তববোধের পরিচায়ক।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শব্দসম্ভারে 'ঐক্য' হলো শ্রুতিমধুর এক প্রিয়তম শব্দ, যার উচ্চারণেও হৃদয়ে জাগায় এক অপূর্ব আবেগ শিহরণ। ঐক্যের প্রতি রয়েছে মানুষের সহজাত প্রেম। কেননা এটা তার হৃদয়ের আকুতি, তার বিবেকের দাবী, তার সৃষ্টিকর্তার পছন্দ। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়েই তাকে বাস করতে হবে মানুষের দুনিয়ায়। নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে সে। সেই প্রতিভার পরশে সাজাবে পৃথিবীর বাগিচা। সে বাগিচার ফলে-ফুলে, রসে-গন্ধে ভরে উঠবে তার জীবন। আর সে জন্য প্রয়োজন একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকার পারস্পরিক ঐক্য সংঘটনের।

ঐক্যে ঐক্যে সংঘাত

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস বলে এ পর্যন্ত সকল মানবীয় ঐক্য নির্মাণের তুলনায় ধ্বংসের ভূমিকাই পালন করেছে বেশী। অর্থাৎ ঐক্য তার স্বভাব, প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত চাহিদার বিপরীত কর্মই করেছে। ঐক্যের অন্তর্নিহিত মর্ম ছিল পারস্পরিক প্রেম ও সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনা এবং বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু পরিবর্তে দেখা দিল ঐক্যের সাথে ঐক্যের সংঘাত। সভ্যতার সাথে পাশবিকতার কিংবা শক্তির সাথে শক্তির সংঘাত খুবই স্বাভাবিক। ঐক্যের সাথে তো ঐক্যের সংঘাত বাধার কথা নয়। কিন্তু সংকোচে হলেও মানুষকে তার সুদীর্ঘ ইতিহাসের এ কলংক স্বীকার করতেই হবে।

এমন হওয়ার কারণ কি? কারণ হলো বুনিয়াদ বা ভিত্তির গলদ। কেননা সব জিনিসেরই ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার বুনিয়াদের প্রকৃতির উপর। ঐক্যের বুনিয়াদ কি? বর্তমান পৃথিবীতে কোন বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যাবতীয় ঐক্য আঁতাত? নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে

ঐক্য হলে, শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসার কোন ঐক্যের বুনিয়াদ হলে সে ঐক্য-আঁতাত তার বিপক্ষ কোন শক্তিকেই বরদাশ্ত করতে রাজি হবেনা মুহূর্তের জন্যও। কেননা একখাপে দুটি তরবারী কিংবা এক গুহায় দুই সিংহের সহাবস্থান সম্ভব নয়, সম্ভব নয় একটি মড়া নিয়ে দুটি ক্ষুধার্ত কুকুরের আপোষ বা সমঝোতা। মানব সভ্যতার ইতিহাস, জাতি ও ধর্মের ইতিহাস মূলত হিংসা, হানাহানি, হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠনের ইতিহাস। যুগে যুগে বয়েছে কত লহুর দরিয়া, তৈরী হয়েছে মানুষের মাথার খুলির হাজার মিনার। ধ্বংস হয়েছে একের পর এক জাতি। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গেছে দেশের পর দেশ। ধুলায় মিশে গেছে কত সমৃদ্ধ নগর, সভ্যতা। ইতিহাস দর্শনের আলোকে সভ্যতার এ ধ্বংসযজ্ঞের কার্যকারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, গোড়াতে এমন এক ঐক্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল যার যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল ক্ষুদ্রতর বা দুর্বলতর ঐক্য-আঁতাত।

নিছক শব্দের কোন তাৎপর্য নেই

মানব জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাস অভিজ্ঞতা সন্দেহাতীতরূপেই এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, নিছক ঐক্য মানব জাতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ও কল্যাণপ্রসূ নয়। প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে ঐক্যের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বুনিয়াদ কি ?

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঐক্যের, প্রথম সূত্রপাত হয় পরিবারকে কেন্দ্র করে। অতঃপর তা ব্যাপ্তি লাভ করে গোত্রীয় ঐক্যে, জাতীয় ঐক্যে এবং আঞ্চলিক ঐক্যে। আর একটু প্রগতিশীল পৃথিবীতে মানুষের মুখের ভাষা-কে কেন্দ্র করে জন্ম নিল ভাষাভিত্তিক ঐক্য। পৃথিবী যখন আরো এগিয়ে গেল তখন সৃষ্টি হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতিভিত্তিক ঐক্য। এতসব ঐক্যের ভিড়ে সাংস্কৃতিক ঐক্যই হতে পারত মানবতার সর্বোত্তম ভরসাস্থল। কেননা নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতনের সাথে সংস্কৃতি ও সভ্যতার কোন সম্পর্ক নেই। সংস্কৃতি ও সভ্যতার অর্থ হলো পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির নিরসন ঘটিয়ে মানুষ মানুষকে উপলব্ধি করবে, জাতিতে জাতিতে মিলন ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে। সহানুভূতি, শুভকামনা ও বন্ধুত্বের সেতু-বন্ধন রচিত হবে, একে অন্যের ভাষা, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি হবে শ্রদ্ধাশীল, আগ্রহী ও সমঝদার। এক কথায় সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে

গড়ে উঠবে সুনিবিড় সখ্যতা। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদের উপর যে, ঐক্য তাতে তো আগ্রাসনবাদী মনোভাবের কথা কল্পনাও করা যেতে পারেনা, মানুষ হয়ে মানুষকে অপমান করা তো তার লক্ষ্য হতে পারেনা, হতে পারেনা অপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনাশ তার কাম্য। প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্ববিরোধ ও বৈপরীত্যের আধার। মানব চরিত্রের রহস্য উদ্ধার তাই এক কঠিন ব্যাপার। বর্তমানের উন্নত মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানও এর সমাধান দিতে পারেনি। কেননা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আরেকটি মানুষ এবং তার দাবী ও চাহিদার রূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন। এমন সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সে নির্ধারণ করে বসে, যা হাজারো মানুষের জন্য হয় ধ্বংসের কারণ। অনেক সময় অন্যের আশা-আকাংক্ষা ও স্বপ্নের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে ওঠে তার আশা-আকাংক্ষা ও স্বপ্নের প্রাসাদ। হিংসার লেলিহান শিখা, ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা এবং আদিম পৈশাচিকতার মধ্যেই যে জীবন দর্শন খুঁজে পায় তার পূর্ণতা ও সফলতা, মানুষকে হত্যা করা এবং মানবতাকে অপমানিত করাই যে জীবন দর্শনের মূল কথা, সে নারকীয় জীবন দর্শনের কোন প্রতিকার আমাদের জানা নেই।

ঐক্যে ঐক্যে সংঘাত

এসব কৃত্রিম ও ভংগুর ঐক্যের মুকাবিলায় ইসলাম বিশ্ব-মানবতাকে ডাক দিয়েছে দুটি বাস্তব বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সার্বজনীন ঐক্যের। সে ঐক্য হবে কল্যাণ ও পবিত্রতার সফলতম ঐক্য। ইতিবাচক ও গঠন-মূলক জীবন সভ্যতার সার্থক ঐক্য। ইসলাম প্রদর্শিত সে ঐক্যের প্রথম বুনিয়াদ হলো, মানব ঐক্য। দ্বিতীয় বুনিয়াদ হলো ঈমানী ঐক্য। অর্থাৎ মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই, নেই ভাষা, বর্ণ ও বংশের শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা পৃথিবীর সব মানুষ এক আদমের সন্তান এবং একই স্রষ্টার সৃষ্টি। বিদায় হজ্জের অভিভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তার খোদাপ্রদত্ত ই'জায-পূর্ণ ভাষায় মানব ঐক্যের যে অনুপম ঘোষণা দিয়েছেন— মানুষে মানুষে ঐক্যের এর চেয়ে বড় সনদ ও ঘোষণা আর হতে পারে না। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের রব (সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক) একজনই এবং তোমাদের আদি পিতাও একজন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিটি মানুষ উপরিউক্ত দুটি ঐক্যের ধারক ও বাহক। একই আদি

মানব থেকে দৈহিক অস্তিত্ব লাভ করেছে জাতি, দেশ, কাল, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ। একই আদি মানবে গিয়ে লীন হয়েছে সকলের বংশধারা। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র নবী আদি পিতা হযরত আদম। অনুরূপভাবে তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালকও এক ও অভিন্ন। এ দুটি সংক্ষিপ্ততম বাক্যে এমন এক মানব ঐক্যের ঘোষণা বিধৃত হয়েছে যে, তার তুলনায় ব্যাপকতর ও গভীরতর এবং তার তুলনায় আকর্ষণীয় ও সহজ-বোধ্য ঐক্য ঘোষণা আর হতে পারেনা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এদু'টি ঐক্যই প্রতিটি মানুষকে অপরের সাথে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত করে রেখেছে। মানব জাতির পিতৃপুরুষ অভিন্ন আর মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও রিযিকদাতা সত্তাও একক, অভিন্ন। সুতরাং দু'টি সূত্রে মানুষ একে অপরের ভাই, পিতার সূত্রে ও স্রষ্টার সূত্রে। পিতৃসম্পর্কটি যেহেতু সার্বজনীন, সহজবোধ্য ও সর্বজনস্বীকৃত, সেহেতু পিতৃসম্পর্কের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় হজ্জে প্রদত্ত মানব ঐক্যের এ ঘোষণা ছিল গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে প্রদত্ত বিশ্বনবীর এক বিশ্বজনীন ঘোষণা।

ঐক্যের নতুন ধারা

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে সূচিত হলো ঐক্যের এক নতুন ধারা। এ ঐক্যের বুনিয়াদ হলো আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস, মানবতার প্রতি সহানুভূতি এবং ন্যায়, সাম্য ও মানব সেবার প্রেরণা।

মদীনা তাইয়্যেবায় যখন ঐ পুন্য জামাতের গোড়াপত্তন হচ্ছিল তখন সংখ্যায়ও শক্তিতে তা ছিল এক ক্ষুদ্র জামাত। মক্কা থেকে বিতাড়িত মুহা-জিরদেরকে মদীনার আনসারদের সাথে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা হলো। কেননা মুহাজিরগণ ছিলেন জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত। তাদের না ছিল কোন বাড়ি-ঘর, না ছিল মাথা গোঁজার ঠাঁই। এ ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সম্পর্ক যার বুনিয়াদ ছিল 'আকীদা ও বিশ্বাস এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর। আপনাদের মধ্যে যারা সীরাত ও নবী-চরিত সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন তারা ভালো করেই জানেন যে, সাংস্কৃতিক ঐক্য কিংবা সামাজিক ঐক্য এসম্পর্কের বুনিয়াদ ছিল না। ভাষার মিল থাকলেও মক্কা মদীনার ভাষায় শব্দ-চয়ন ও বাচনভংগিতে এত বেশী অমিল বিদ্যমান ছিল যে, উভয়ের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের জন্য তা ছিল যথেষ্ট। একথা আপনাদের

অজানা নয় যে, সামান্য ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে একই ভাষার মাঝে দেখা দেয় বিরাট তারতম্য এবং এর ফলে এমন তিক্ত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে থাকে যা শুধু দুটি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যেই কল্পনা করা সম্ভব। আমার মনে হয় এ সম্পর্কে পৃথিবীর খুব কম দেশেরই পাকিস্তানের মত তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মক্কা মদীনার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে সাদৃশ্য ও অভিন্ন-তার যে ধারণা পোষণ করা হয় তা ঠিক নয়। সীরাত সম্পর্কিত সর্বশেষ গবেষণা এ কথাই প্রমাণ করে যে, মক্কা-মদীনার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় যথেষ্ট অমিল বিদ্যমান ছিল। মক্কার কোরেশ রক্তে ছিল অতিমাত্রায় শ্রেষ্ঠত্ববোধ। আপনারা নিশ্চয় জানেন, বদর যুদ্ধের শুরুতে কোরেশের তিন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ওতবা, শায়বা ও রবীয়া মুসলমানদেরকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আহবান জানিয়েছিল, তাদের মুকাবিলায় মাঠে নেমেছিলেন মদীনার তিন আনসারী সাহাবা, কিন্তু কোরেশ পক্ষ এই অজুহাতে তাঁদের সাথে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করল যে, তোমরা ভদ্রলোক বটে তবে আমাদের সমকক্ষ যারা তাদের পাঠাও। এ থেকেই কোরেশদের গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া মদীনার সমাজ-সংস্কৃতিতে য়াহূদীদেরও ছিল বিরাট আধিপত্য। য়াহূদীদের ছিল নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি, সমগ্র আরব উপদ্বীপে শিক্ষা-দীক্ষায় য়াহূদীরাই ছিল একমাত্র উন্নত জাতি; তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত লেখাপড়া করত। অন্যদের তারা উম্মী বলে আখ্যায়িত করত। কুরআনুল করীমে তাদের মন্তব্য এভাবে উল্লিখিত হয়েছে "এরা মূর্খের দল। এদের সাথে কোন আচরণই আমাদের জন্য অপরাধ নয়।" অন্যান্য জাতি সম্পর্কে এখনও য়াহূদীরা অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, এ ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহৃত শব্দ হলো (অসভ্য) ভিন জাতি।

সীরাতের বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন আপনাকে এ ধারণাই দেবে যে, ভাষার মিল এবং এক পর্যায়ে বংশধারার অভিন্নতা সত্ত্বেও মক্কা-মদীনার সমাজ ব্যবস্থায় ছিল দুস্তর ব্যবধান যা সচরাচর দুটি ভিন্ন দেশের ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাতেই পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই মদীনায় হিজরতকালে এ আশংকা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল যে, দু'টি ভিন্ন সামাজিক পরিমণ্ডলে লালিত মুসলমানগণ হয়ত একে অন্যের সাথে দুধ চিনির মত মিশে গিয়ে একটি অভিন্ন স্বভাব গ্রহণ করতে পারবে না (হাকীম সাহেবের প্রতি সৌজন্যবশত চিকিৎসাশাস্ত্রের

পরিভাষায় বলছি) যেমনটি বিভিন্ন উপাদানে তৈরী আপনাদের হালুয়ার বেলায় ঘটে থাকে। এ আশংকা বিদ্যমান ছিল যে, আনসার ও মুহাজিরদের সংমিশ্রণে মদীনায় যে ইসলামী হালুয়া তৈরী হচ্ছিলো তাতে উপাদান দুটি তাদের ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিলীন করে একে অপরের সাথে সম্পূর্ণ-রূপে হয়ত মিশে যেতে পারবে না। আর একথা হাকীম সাহেবের চেয়ে ভালো আর কে জানবে যে, হালুয়ার উপাদানগুলো নতুন ও সম্মিলিত ক্রিয়া গ্রহণ না করে যদি নিজস্ব গুণ বজায় রাখে তবে তা উপকারী হতে পারে না কিছুতেই।

সমস্যা শুধু আনসার মুহাজির মিলনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। খোদ আনসাররাও ছিল চিরশত্রু বিবদমান দু'টি বড় গোত্রে বিভক্ত। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সর্বশেষ ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল হিজরতের মাত্র পাঁচ বছর আগে। উভয় গোত্রের কবিদের হাতেই রচিত হয়েছিল বীর-যোদ্ধাদের বীরত্ব-গাথা, যা গোত্রীয় মজলিসে পঠিত হতো বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে। গোত্রদ্বয়ের ইসলাম গ্রহণের পরও সুযোগ পেলেই য়াহূদীরা পুরনো শত্রুতা নতুন করে চাংগা করার চেষ্টা করত এবং গোত্রীয় কবিদের রচিত জ্বালাময়ী কবিতা আবৃত্তি করে নিভে যাওয়া আগুন ফের উসকে দেওয়ার প্রয়াস চালাত। সীরাতের বর্ণনায় দেখা যায়, য়াহূদীদের কারসাজিতেই একবার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় উন্মুক্ত তরবারী হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করেছিল। সংবাদ পেয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ঈমান ও ইস-লামী প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের সুশীতল বারি সিঞ্চনে জাহেলী ক্রোধের প্রজ্বলিত আগুন নিভে গেল।

মোটকথা, একটি নতুন শক্তির অভ্যুদয়ের পরিবর্তে একটি নবতর বিশৃংখলা জন্ম নেওয়ার আশংকাই ছিল বেশি এবং তার পর্যাপ্ত উপাদানও সেখানে ছিল বিদ্যমান যে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া একা য়াহূদীদের অস্তিত্বই ছিল অরাজকতা সৃষ্টির যথেষ্ট উপাদান। দুনিয়ার খুব কম জাতিই য়াহূদীদের মত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের যোগ্যতা রাখে। আজো পর্যন্ত তাদের এ জাতীয় প্রতিভা অটুট রয়েছে। সুতরাং মদীনায় আনসার মুহাজির কিংবা আওস-খাযরাজের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের এই জাতীয় প্রতিভা কাজে লাগানোটাই ছিল

স্বাভাবিক। মক্কার অর্থনৈতিক জীবনধারা ছিল বাণিজ্য-নির্ভর। পক্ষান্তরে মদীনার জীবনধারা ছিল কৃষি-নির্ভর। উভয় অঞ্চলের স্বতন্ত্র ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যই ছিল এ ভিন্নতার কারণ। উভয় অঞ্চলের পারিবারিক জীবনও ছিল বেশ স্বতন্ত্র। হযরত ওমর (রা) তাঁর এক বর্ণনায় সেদিকে ইঙ্গিতও করেছেন।

বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের ঐক্য

দুটি বিপরীতধর্মী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে শুধু বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের এমন সুসংহত ও সফল প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই। নিছক বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতাই তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। পৃথিবীকে চরম ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার মহান লক্ষ্যে ঐশী তত্ত্বাবধানে উত্থিত হচ্ছিল এক নতুন শক্তি।

সংখ্যায় ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে মহান

এই যে ক্ষুদ্র ভ্রাতৃ সংগঠনটি জন্ম নিচ্ছিল, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কি ছিল? লোকজন কি ছিল? কুরআনুল করীমে আমরা তার নিখুঁত চিত্র দেখতে পাই। আল-কুরআনের ভাষায়ঃ

"স্মরণ করো সেদিনের কথা যখন পৃথিবীতে তোমরা সংখ্যায় ছিলে মুষ্টিমেয়, শক্তিতে ছিলে দুর্বল। তোমরা সদা শংকিত থাকতে যে, শত্রু বুঝি-বা তোমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।"

এই ছিল বাস্তব পরিস্থিতি, কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কি মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছিল এই নগণ্য দুর্বল মুসলিম জামাতকে। এ সম্পর্কিত আয়াতটি যতই আমি তিলাওয়াত করি ততই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে আমার হৃদয়। এ নতুন ভ্রাতৃগোষ্ঠীর ও ঐক্য সংগঠনের দায়িত্ব কি ছিল, কেমন কন্টকাকীর্ণ ও সংকটাপন্ন ছিল তার চলার পথ। আর আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের সে কর্তব্যের গুরুত্ব ছিল কত অপরিসীম। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, "হে আনসার ও মুহাজিরবৃন্দ! যদি তোমরা উদ্যোগী হয়ে এই নবতর ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন না কর এবং তা দৃঢ়করণে যত্নবান না হও তবে পৃথিবী তলিয়ে যাবে ব্যাপক অনাচার ও অরাজকতায়।"

আলোচ্য আয়াতের শব্দ ক'টি সত্যি সত্যি আমাকে হতবুদ্ধি করে দেয়। কি শক্তিইবা ছিল এ ক্ষুদ্র দলটির। বত্রিশটি দাঁতের মাঝে অসহায় একটি জিহবা কিংবা মহাসাগরের বুকে ক্ষুদ্র বিন্দুর চেয়ে বেশী কিছু তো নয়। আনসার মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলই-বা। কিন্তু মানব সভ্যতার গতিধারায় প্রভাব বিস্তারের কতটুকু সামর্থ্য আছে আর পৃথিবী-ব্যাপী অনাচার ও অরাজকতার মহাসয়লাব রোধ করা কি করে সম্ভব তার পক্ষে!

কিন্তু এ ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা আল্লাহ্ পাক যে মহান কাজ সমাধা করার ইচ্ছা করেছিলেন এবং মানব সভ্যতা ও পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য এ ঐক্য প্রয়াসের যে মহা প্রয়োজন ছিল, সে কারণেই তাকে এ অনন্য মর্যাদা ও খেতাবে বিভূষিত করা হয়েছে।

ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত এ জামাতের অন্তর্নিহিত উদ্যম ও প্রেরণা, মানবতার প্রতি তাঁদের দরদ ও মর্ম বেদনা, তাদের বিনিদ্র রাতের আহাজারি ও কর্মচঞ্চল দিনের উৎকণ্ঠা, মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো এবং হিদায়তের পথে পরিচালিত করার জন্য তাঁদের ব্যাকু-লতা ও কাতরতা, সর্বোপরি আল্লাহ্‌র পথে জীবন, সম্পদ, সন্তান ও প্রাণসহ সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিযোগিতার অনুপম কাহিনী যাঁদের আছে, আর যাঁদের অটল বিশ্বাস আছে আল্লাহ্ পাকের সর্বময় ক্ষমতা ও কুদরতের উপর, তাঁদের পক্ষেই শুধু সম্ভব আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করা। অন্যথায় সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহা অবক্ষয়ের পরিবেশে একথা বুঝতে পারা খুবই কঠিন যে, কি কারণে এমন একটি অসহায়, দুর্বল ও ক্ষুদ্র দলকে বসানো হচ্ছে এত বড় মর্যাদার আসনে। তোমরা যদি উদ্যোগী হয়ে এই নবতর ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন না করো এবং তা দৃঢ়করণে যত্নবান না হও তবে ভয়াবহ গোলযোগ ও বিশৃংখলার লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেবে মানুষের এই পৃথিবীকে। খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস পড়ুন। দেখতে পাবেন, ধ্বংসের কি ভয়াবহ আগুনে জ্বলছিল গোটা পৃথিবী। শক্তির মদমত্ততায়, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের উন্মাদনায় এবং শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহমিকায় অন্ধ মানুষের হাতে কি মুমূর্ষু দশা ঘটেছিল মানব সভ্যতার। সে সম্পর্কে একটি নিখুঁত ও জীবন্ত ছবি তুলে ধরেছেন দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল তাঁর এক কবিতায়।

"আলেকজাণ্ডার ও চেংগীয খাঁর রক্তাক্ত হাতে বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে পৃথিবীর নাযুক দেহ। শোন বন্ধু! বিশ্ব ইতিহাসের এ পাঠ চিরন্তন! শক্তির মদমত্ততা অতি ভয়ংকর। এ সর্বপ্লাবী ঢলের মুখে জ্ঞান, শিল্প ও বুদ্ধিবিবেক সব ভেসে যায় খড়কুটার মত।"

ক্ষুদ্র এক ভ্রাতৃগোষ্ঠীর কাঁধে বিশ্বের দায়িত্ব

শক্তির সে মদমত্ততা পৃথিবীর যে সর্বনাশ করেছিল তার প্রতিকারের মহান ব্রত নিয়ে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে অংকুরিত হলো এক নতুন চারাগাছ। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হলো এক নতুন ভ্রাতৃসংগঠন। গোড়াপত্তন হলো এক নতুন ঐক্যের আর তার কাঁধে অর্পিত হলো বিশ্বমানবতার হিফাজত ও সংরক্ষণের মহাদায়িত্ব। الا تفعلوه। যদি দৃঢ়তার সাথে ঐক্য স্থাপন এবং তার বিকাশ সাধনে ব্রতী না হও, সে ঐক্যের প্রতি যদি অনুগত ও একনিষ্ঠ না হও, যদি না হও মানবতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, মানবতার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ বা দলীয় স্বার্থ নিয়েই যদি তোমরা মেতে ওঠো, তবে মনে রেখো, মানব সভ্যতার এ আবাসভূমি ভেঙে যাবে অনাচার ও পাপা-চারের সয়লাবে, ধ্বংস ও অকল্যাণ ছাড়া মানবতার ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না তখন। এ বিপ্লবী আয়াত যখনই আমি পড়ি তখনই ভয়-বিহবলতায় কেঁপে ওঠে আমার হৃদয়, আমার সমগ্র আত্মা। সাগর বক্ষে বিন্দুর মত ক্ষুদ্র অস-হায় ও দুর্বল এক জামাতকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করছে, গোটা বিশ্বের দায়িত্ব বুঝে নাও। সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের স্নিগ্ধ পরশে মুমূর্ষু মানবতাকে বাঁচিয়ে তোল। অন্যথায় মানবতার মৃত্যু এবং বিশ্ব ও বিশ্ব-জগতের ধ্বংস অনিবার্য। ঐক্যবদ্ধ অপশক্তিগুলো তখন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে মানবতার লাশ। এগুলো কল্যাণের ঐক্য নয়—ধ্বংসের ঐক্য। মানবতাকে রক্ষার ঐক্য নয়—মানবতাকে শতধা বিভক্ত করার ঐক্য। একটি ঐক্যের জীবন ও সফলতা নির্ভর করে আরেকটি ঐক্যের মৃত্যু ও মর্মান্তিক পরিণতির উপর। এক জনগোষ্ঠীর জৌলুস ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে আর সব জনগোষ্ঠীর সর্বনাশের উপর। সে ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে। ঐক্যের নামে পৃথিবীতে আজও চলছে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা, বিভেদ-অনৈক্যের আত্মঘাতী মহড়া। যে কোন দেশ, যে কোন সংগঠন, দর্শন বা ইজম সম্পর্কে আপনি জানতে চাইবেন—খুব সরল ভাষায় আপনাকে উত্তর দেওয়া হবে "এটা আমাদের ঐক্য প্রচেষ্টা।" কিন্তু কোন ঐক্যই অপর ঐক্যকে এক

মুহূর্তের জন্যও বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। প্রতিটি ঐক্যের লক্ষ্য অন্য সব ঐক্যের সমূলে ধ্বংস সাধন। সুতরাং যদি কোন ঐক্যপ্রয়াস মানবতার জন্য কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনতে পারে তবে তা হলো ইসলাম নির্দেশিত বিশ্বজনীন ঐক্য আর সে ঐক্যের বুনিয়াদ হলো দুটি ঃ মানব ঐক্য এবং ঈমানী ঐক্য।

ভাষাভিত্তিক ঐক্যের ধ্বংসাত্মক পরিণতি

এই নিষ্পাপ জিহ্বা যা ফুল ঝরায়, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন ঘটায়, প্রেমের গান শোনায়, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি ও মিলন সেতু রচনা করে। এ ভাষা—যার উৎপত্তি হয়েছিল হৃদয়ের গভীর প্রদেশ থেকে ভালোবাসার নির্মল ধারা প্রবাহিত করার জন্য, দূরকে নিকট এবং নিকটকে নিকটতর করার জন্য—সে ভাষার বেদীমূলেই বলি হয়েছে নিষ্পাপ অসহায় কত মানুষ। অথচ তাদের মুখেও ছিল একটা ভাষা। সে ভাষায় ছিল হাসি-কান্না, ছিল প্রেম ও অনুরাগ। তথাকথিত ভাষাভিত্তিক ঐক্য মানুষকে প্ররোচিত করেছে মানুষেরই বুকে হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়তে। ভাষাকে যখন ঐক্যের বুনিয়াদ করা হয়েছে—যার অনুকূলে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোন সনদ নাযিল করা হয়নি—তখন এই নিষ্পাপ ভাষাই হয়েছে সমস্ত অকল্যাণ ও ধ্বংসের বাহন। এ ভাষাই তখন রূপ নিয়েছে এমন এক অপশক্তির যা নবী-রাসূলদের সকল মেহনত এবং দুনিয়ার সকল সংস্কার প্রচেষ্টাকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে এক মুহূর্তে। হাজার বছরের সাধনায় সঞ্চিত সভ্যতার ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদভাণ্ডার এই ভাষা। সে ভাষাভিত্তিক ঐক্য পৃথিবীর বুকে এমন সব কাণ্ড ঘটিয়েছে যে, মানুষকে তা ভেবে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। আর আপনাদের তো এ তিক্ত অভিজ্ঞতা একবার হয়েছে। আমার মতে পাকিস্তান এখনো শংকামুক্ত নয়। যে কোন ধূর্ত ও সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি ভাষার শ্লোগানকে ঐক্যের নামে ব্যবহার করে আবার ছড়িয়ে দিতে পারে জাহেলী যুগের বীজ। ভাষাভিত্তিক ঐক্য আবারো ব্যবহৃত হতে পারে রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়াররূপে। মানুষের মুখের ভাষা আজ চেংগীয খানের তরবারীর মত ধ্বংসলীলা ঘটাতে পারে পৃথিবীর যে কোন দেশে।

সভ্যতার নামে সৃষ্ট ঐক্যের পরিণতি

সে সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য হলো মানুষকে মানুষ বানানো, মানুষের মধ্যে নিজের খুঁত ও দুর্বলতার অনুভূতি জাগ্রত করা, অন্যের গুণাবলী ও প্রতিভার স্বীকৃতি দানে উদ্বুদ্ধ করা, যে সভ্যতার প্রেরণায় মানুষ সৌন্দর্যের পূজায় সুন্দরের সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করে, শিল্পের অনুসরণ করে, শিল্পীর গলায় ফুলের মালা পরায়, একগুচ্ছ কবিতার জন্য হৃদয় উজাড় করে দেয় এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলে সংগীতের সুরমূর্ছনায়, সে সভ্যতার মর্মবাণী এই যে, দেশ-কালের উর্ধ্বে মানুষ সত্য; সুতরাং এক মানুষের সকল অবদান গোটা মানবতার সম্পদ, সবার তাতে রয়েছে সমান অধিকার,সে সভ্যতাই আল্লাহ্ রাসূলের পথ-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়ে রূপ ধারণ করে চরম পাশবিকতার। আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন, সভ্যতার বিরুদ্ধে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংস্কৃতি কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংগীন উঁচিয়ে। "ঐক্যই কল্যাণ, ঐক্যই প্রগতি"—এ ভেল্কির জারিজুরি আজ ফাস হয়ে গেছে। ঐক্যের বুনিয়াদ যদি ঈমান ও ভ্রাতৃত্ব ছাড়া অন্য কিছু হয় তবে মানবতার জন্য সে ঐক্য আশীর্বাদ নয়—অভিশাপ, কল্যাণের উৎস নয়—ধ্বংসের বাহন। পৃথিবী বারবার এ অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের কারণ

আপনাদের অনেকেই হয়ত ১৯১৪ ও ১৯৩৯-এর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন। আর অনেকে হয়ত শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন। এসব যুদ্ধ, এসব হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ কিসের জন্য? মানবতার কোন্ কল্যাণের জন্য দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধের নারকীয়তা পৃথিবীকে ভোগ করতে হয়েছিল? সে কি অন্যায়ের সাথে ন্যায়ের বিরোধের পরিণতি, না স্বার্থের সাথে স্বার্থের সংঘাতের ফল? প্রতিটি যুদ্ধ ও প্রতিটি ধ্বংসের পেছনেই সক্রিয় রয়েছে ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারের উন্মাদনা, দেশ জয় ও লুণ্ঠনের উদগ্র লালসা। পৃথিবীতে যত অনাচার, যত অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তাতে কোন দেশ ও জাতির বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। সংঘাত শুধু এখানে যে, আমাদের নেতৃত্ব ও খবরাদারিতে হতে হবে সব কিছু। পৃথিবীর বর্তমান ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থায় দোষের কিছু নেই, তবে অমুক জাতির অমুক দেশের আধিপত্য ও ইজারাদারি খতম করতে

হবে। তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আমাদের উপনিবেশ। কেননা পৃথিবীতে আমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথাই ধরুন। কোন্ সে মহৎ উদ্দেশ্য সক্রিয় ছিল পৃথিবীব্যাপী এমন ভয়াবহ একটি ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে? জার্মান জাতি দেখল বিশ্ব বাজারে, বিশ্বের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে এবং বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ-ভাণ্ডারে বৃটিশেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। বৃটিশ আধিপত্য উৎখাত করে যে কোন মূল্যে জার্মান জাতির একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে হবে বিশ্বের বুকে। আমাদের উপমহাদেশের রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতা অভিন্ন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র জনসমাবেশে সুস্পষ্ট ভাষায় আমি একথা বলেছি। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় গেড়ে বসা দুর্নীতি, অনাচার ও অবক্ষয়ের ব্যাপারে আজকের রাজনৈতিক দলগুলোর কোন মাথাব্যথা নেই। মুখে স্বীকার না করলেও প্রত্যেকের দাবী শুধু এই যে, আমাদের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে চলুক সবকিছু। আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, যে কোন রাজনৈতিক দলের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করুন, দেখবেন ক্ষমতার হাত বদলই শুধু হয়েছে, অবস্থার গুণগত কোন পরিবর্তনই হয়নি। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছাড়া মৌলিক কোন মতবিরোধ নেই, নৈতিকতা ভিত্তিতে কোন মতানৈক্য নেই।

আরেকটু উপরের (?) দিকে দৃষ্টি দিন। ইউরোপীয় জাতিবর্গ একে অন্যের বিরুদ্ধে একাধিকবার যেসব নারকীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলোতে ন্যায়-অন্যায় ও নীতিবোধের বালাই ছিল না, ছিল না মানব জাতির কল্যাণ-অকল্যাণ বা জীবনদর্শনের প্রশ্ন, এমনকি ছিল না খৃস্টবাদ-অখৃস্টবাদের দ্বন্দ্বও। সবকিছুর মূলে ছিল একটি মাত্র অহমিকাঃ গোটা পৃথিবীকে আমাদের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। মাফ করবেন, আমাদের তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক সংগঠনগুলো একই ধারায় চিন্তা করতে অভ্যস্ত। মানবীয় শক্তি ও প্রতিভার অপচয় হচ্ছে, কিন্তু তাতে কারো কোন মর্মবেদনা নেই। যুবসমাজ তলিয়ে যাচ্ছে নৈতিক অবক্ষয়ের অতলান্তে, (ঔপনিবেশিক) শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দিচ্ছে গোটা জাতির মেরুদণ্ড, কিন্তু সেজন্য কারো কোন উৎকণ্ঠা নেই; বরং সবটুকু মেধা, শক্তি, সময়, শ্রম ব্যয় হচ্ছে ক্ষমতা-দখলের দ্বন্দ্বে।

পাকিস্তানের সমস্যা

পাকিস্তান আজ তার নিজ ভূখণ্ডেই শুধু ঐক্যের দাবিদার নয় বরং সারাবিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে পাকিস্তান হলো ইসলামী ঐক্যের সংগঠন ও মুখপাত্র। কিন্তু আপনারা যদি এ মহান দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান, আপনাদের দেশে যদি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ভাষার দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক সংকট কিংবা আঞ্চলিক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ফিতনা, মনে করুন আপনাদের কারো মনে উথলে উঠল ইসলাম-পূর্ব সংস্কৃতির প্রেম, শুরু হলো সেই সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন, তবে অবধারিতভাবেই ধরে নিতে হবে যে, পাকিস্তানের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠেছে। কেননা এদেশের বিভিন্ন-মুখী ধারা-প্রকৃতির জনসমষ্টিকে সংযুক্তকারী মাধ্যম হলো ঈমানী ঐক্য, বিশ্বাসের মিল এবং ইসলামী একতা। এক্ষেত্রে যদি কৃত্রিম ঐক্যের দাবী মাথাচাড়া দেয়, যদি মানুষের গড়া বিভিন্ন নামের প্রতিমার বন্দনা শুরু হয়, তবে প্রতি মুহূর্তেই পাকিস্তানের জন্য রয়েছে সমূহ আশংকা। তাই কবি ইকবালের ভাষায় বলছিঃ বর্ণ বংশের প্রতিমাগুলো গুড়িয়ে দাও, মিশে যাও অভিন্ন জাতি-সত্তায়, ভেদাভেদ তুলে দাও ইরান, তুরান ও আফগানের। তুরস্কের জিয়া গোকল্প-এর তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে মধ্য-এশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। ইরানেও মাঝে মধ্যে ইসলাম-পূর্ব যুগের পারসিক সভ্যতা কবর খুঁড়ে বের করে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনাদের পাকিস্তানেও যদি অনুরূপ কোন আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে তবে তা হবে পাকিস্তানের অস্তিত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। আমি আবারো আরয করব, একমাত্র ঈমানী ঐক্য বা ইসলামী ঐক্যই হলো আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল। অন্য কোন ঐক্য যদি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে সক্ষম হয় তবে শাব্দিক অর্থেই দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়বে, শক্তিতে শক্তিতে সংঘাত বাধবে এবং জাহেলী যুগের যে অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করেছিল সাম্য ও মৈত্রীর ইসলাম, সে অভিশাপ আবার নেমে আসবে আমাদের জাতীয় জীবনে। সম্ভবত অন্য কোন বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এতটা তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন নি—যতটা করেছেন জাহেলী যুগের সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে। কেননা আল্লাহ্ পাক তাঁকে দান করেছিলেন বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি। ওয়াহীর মাধ্যমে সকল গুপ্ত রহস্য ও নিগূঢ় তত্ত্বই ছিল তাঁর

অন্তর্জগতে উদ্ভাসিত। কাজেই জাতিসমূহের ইতিহাস ও পরিণতি ছিল তাঁর নখদর্পণে। আর তাই সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকেই তিনি মনে করতেন একটি জাতির ধ্বংসের সবচেয়ে বড় কারণ। তাই নবী যবান থেকে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ تَعَزَّى عَلَيْكُمْ بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاعْضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوا ـ

তোমাদের সামনে কেউ যদি জাহেলী সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ায়, কোন গোত্র, দেশ, জাতি বা ভাষার দোহাই দেয় কিংবা অন্য কোন জাতির প্রতি অপমানজনক উক্তি করে, গোত্রীয় ও বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে, আকারে ইঙ্গিতে নয় বরং সরাসরি তাকে আক্রমণ করে কথা বলে, তোমাদের ভাষায় বাছাই করা কঠিনতম শব্দগুলো তার জন্য প্রয়োগ করো। কেননা তার ঐশী-প্রদত্ত অন্তর্দর্পণে পরিষ্কারভাবেই এটা প্রতিভাত হয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা এমন এক মহাঅভিশাপ যা মুহূর্তে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় হাজার বছরের সমস্ত সাধনায় গড়ে উঠা জ্ঞান, সভ্যতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। নিষ্ফল করে দেয় আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের হাজার রাতের রোনাজারী, নিঃস্বার্থ ও বিদগ্ধ সমাজ সংস্কারকদের দীর্ঘ জীবনের সংগ্রাম সাধনা। সাম্প্রদায়িকতা হলো এক প্রচণ্ড ঝড়, মুহূর্তে যা অন্ধকার করে দেয় গোটা দুনিয়া। আপনাদের সবার কাছে আমি আমার সতর্কবাণী পৌঁছে দিতে চাই। এদেশের জন্য বিপদজনক কিছু যদি থেকে থাকে তবে তা হচ্ছে মৃত সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং ভাষাভিত্তিক ও আঞ্চলিক আন্দোলন। আমি শুধু একা পাকিস্তানের কথাই বলছি না। মিসর, ইরানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের বেলায়ও এই সতর্কবাণী প্রযোজ্য। কাজেই ইসলামী ঐক্যকে সুদৃঢ় করাই হচ্ছে আজকের ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। ইসলামী ঐক্যই ইসলামী উম্মাহ্‌কে দিতে পারে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, দিতে পারে বিনির্মাণ ও সৃষ্টির সোনালী ইঙ্গিত। কেননা এ ঐক্যই শুধু মানুষে মানুষে সৃষ্টি করে সম্প্রীতির বন্ধন, হৃদয়ে হৃদয়ে ঘটায় স্বর্গীয় মিলন। অনেক আগেই আমাদেরকে আল্লাহ্ পাক এ নেয়ামত দান করেছেন।

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ـ

"স্মরণ করো আল্লাহ্‌র সে অনুগ্রহকে, যখন তোমরা পরস্পরের দুশমন ছিলে, ছিলে একে অন্যের খুন পিয়াসী। তখন আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে অন্তরে মিল সৃষ্টি করলেন। তোমরা তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে।" এমন ভাই ভাই হলে যে, বিস্ময়ে মানুষ 'থ' হয়ে গেল। সীরাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় আপনি দেখতে পাবেন সে মহান ভ্রাতৃত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত। হযরত মুস'আব বিন উমায়র (রা.)-র ভাই আবূ 'উমায়রকে হাত-পা বেঁধে বন্দী করা হচ্ছিল। হযরত মুস'আব সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখে বললেন, কষে বাঁধ একে। বড় ধরনের আসামী। এ মোটা অংকের মুক্তিপণ আদায় করা যাবে। বিস্ময়ে বিমূঢ় আবূ 'উমায়র তার সহোদর মুস'আবের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ তুমি না আমার মায়ের পেটের ভাই। দ্বিধাহীন চিত্তে, স্থির প্রত্যয়ের সাথে হযরত মুস'আব উত্তর দিলেন ঃ না, তুমি আমার ভাই নও। আমার ভাই তো ইনি যিনি তোমাকে বাঁধছেন। বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের ঐক্য এমনি মহান ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেছিল ইসলাম ও ঈমানের আলোকস্নাত মদীনার সেই পুণ্য সমাজ। এর বিপরীতে ভাষাভিত্তিক ঐক্যের অবস্থা আপনাদের জানা আছে। একই ভাষাভাষীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কত ঠুনকো। ভাষা কি তাদের মাঝে ন্যূনতম সম্প্রীতি ও সৌহার্দ স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল? মানুষকে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে কোন মহত্তম জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছিল? কিংবা সৃষ্টি করেছিল মানবতার কল্যাণে ব্রতী হওয়ার প্রেরণা? ভিন্ন ভাষীদের সাথে স্বার্থের সংঘাতে ঐক্যবদ্ধ লোকগুলো পরবর্তীতে নিজেরা কি আর দুধ চিনির মত সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে? নিজের জান মাল ও ইজ্জত-আবরুর মত অন্যের ইজ্জত-আবরুও কি একই দৃষ্টিতে দেখতে শেখে? দার্শনিক কবি ইকবাল কি সুন্দরই না বলেছেন ঃ ভাষার ঐক্যের চেয়ে হৃদয়ের ঐক্যই উত্তম। ভাষা হলেই কিছু কাজ হয় না, মনও এক হতে হয়। আর হৃদয়ে হৃদয়ে ঐক্য, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব এবং জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি ভাষার

কর্ম নয়। ভাষা শুধু পারে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করতে, শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে এক অভিন্ন স্বার্থে সাময়িকভাবে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করতে।

আপনারা ইসলামী ঐক্যের পতাকাবাহী

আল্লাহ পাক আপনাদের ইসলামী ঐক্যের নেয়ামত দান করেছেন, সেই সাথে অভিষিক্ত করেছেন সে ঐক্যের প্রতি মানবতাকে আহবানের মহা মর্যাদায়। ইসলামী ঐক্যের কল্যাণ কত সুদূরপ্রসারী, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বরকত ও সুফল কত ব্যাপক ও গভীর—সে দৃষ্টান্তই আজ পাকিস্তানকে তুলে ধরতে হবে বিশ্বের দরবারে। আপনাদের হাতে সম্পাদিত হতে হবে পাকিস্তানের এমন আদর্শ বিনির্মাণ যে, ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের পরিচয় পেতে হলে ঈমানের আলোকস্নাত মদীনার সেই পুণ্য সমাজের কথা জানতে হলে পাকিস্তানকে দেখেই যেন জানতে পারে বিভিন্ন জাতির শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব পিয়াসী মানুষ। ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের বুকে এমন কোন ঐক্য প্রয়াস যেন মাথা তুলতে না পারে যা শিথিল করবে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন, ছড়িয়ে দেবে হিংসা ও জিঘাংসার আগুন। আল্লাহ্ না করুন তেমনটি হলে সমস্যার এমন জটিল আবর্ত সৃষ্টি হবে পাকিস্তানের জন্য, যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না কোন ঝানু রাজনীতিবিদের ঝুলিতে কিংবা প্রতিভাবান কোন জাতীয় নেতার মগজে। বস্তুত এটা হবে আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতের অবমাননা। কোন্ আকর্ষণে কিসের ডাকে মুসলমনরা এখানে এসেছে? কোন্ আলোর ইশারায় পতংগের মত এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে তারা ঝাঁপ দিয়েছে? সে কি ভাষার টানে কিংবা সভ্যতা ও সংস্কৃতির আকর্ষণে! এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় ও সামাজিক পরিবেশে এত বেশী তফাৎ যা দুটি ভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীতেই হতে পারে। এই সম্মানিত মজলিসের উপর একটু দৃষ্টি বুলালে আপনি নিজেও সে পার্থক্য টের পাবেন। কিন্তু সব পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের পরও এক অভিন্ন মযবুত বন্ধন আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। আর তা হলো ঈমানী ঐক্যের বন্ধন, এই ঈমানী ঐক্যই আপনাদের অস্তিত্বকে সংঘবদ্ধ ও সংহত করতে পারে, পারে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে। সুতরাং এ মহা নেয়ামতের গুরুত্ব উপলব্ধি করুন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে এর আহবায়কের দায়িত্ব পালন করুন। এতেই নিহিত রয়েছে আপনাদের নিজেদের কল্যাণ এবং বিভেদ বিভক্তি জর্জরিত মানবতার কল্যাণ।

দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে এসেও মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে আমার বক্তব্য শুনে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন সেজন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে হাকীম মুহম্মদ সাঈদ সাহেবকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। কেননা তাঁর সৌজন্যেই আমরা এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছি। আল্লাহ্ সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

ইসলামী বিশ্বের অন্তর্বর্তীকাল

(১৮ই জুলাই ইসলামাবাদ হোটেলের সম্মেলন কক্ষে পাকিস্তান ইসলামী আইন গবেষণা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব আনোওয়ারুল হক। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিবৃন্দ, কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীবর্গ, ইসলামী আইন গবেষণা পরিষদের সদস্য-বৃন্দ এবং দেশের বিশিষ্ট আলিম ও বুদ্ধিজীবিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছেন ইসলামী আইন পরিষদের সভাপতি বিচারপতি মুহম্মদ আফযল)।

হামদ ও সালাতের পর!

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত সুধীবৃন্দ! আজকের এ দুর্লভ মুহূর্তটি আমার জন্য খুবই আনন্দ ও সৌভাগ্যের। কেননা যাঁদের প্রত্যেকের খিদমতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া এবং অধ্যয়ন ও চিন্তার নির্যাস পেশ করা ছিল আমার কর্তব্য তাঁরা নিজেরাই অনুগ্রহ করে এখানে উপস্থিত হওয়ার কষ্ট স্বীকার করেছেন। এটা যেমন আনন্দকর তেমনি দায়িত্বপূর্ণও। তাই আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না যে, সৌভাগ্যের কথা ভেবে আনন্দিত হবো না দায়িত্বের অনুভূতিতে চিন্তিত হব। যাই হোক এটা আমার মনের বর্তমান মিশ্র অনুভূতি যা নিঃসংকোচে আমি আপনাদের কাছে পেশ করছি।

মুহূর্তের অসতর্কতা, শতাব্দীর মাশুল

সুধীমণ্ডলী! ইসলামী বিশ্বে আমরা আজ চরম সংকটকালীন সময় অতিক্রম করছি। এটা সময়ের এক নাযুক সন্ধিক্ষণ, অন্তর্বর্তীকালীন সময়। আর অন্তর্বর্তীকালীন সময় স্বভাবতই খুব নাযুক ও সংকটপূর্ণ হয়ে থাকে। ইসলামী বিশ্বের নেতৃবর্গ দেশ ও জাতির মেধা ও মস্তিষ্ক যদি এখন একটি মুহূর্তও বিনষ্ট করে কিংবা খুটিনাটি ও সাময়িক স্বার্থ নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ে তবে জীবন যুদ্ধের গতিশীল বিশ্ব কাফেলা আমাদের জন্য থেমে থাকবে না। ইতিহাসও আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুকম্পা প্রদর্শন করবে না। কালের স্রোতকে পাল্টা স্রোত দিয়েই শুধু ঠেকানো যায়। মাঝ দরিয়ায় কোন কিশতি ডুবে গেল বলে স্রোতের গতি স্তব্ধ হয়ে পড়ে না। কেননা স্রোতের গতি সাগর মুখী। আর সময় বড় নিষ্ঠুর। আমার মতে আপনাদের কবি হালী তাঁর নিজস্ব কল্পনার সীমিত পরিমণ্ডলেই বলেছেন তবে বড় সুন্দর বলেছেন ঃ যাবার আনন্দ পায় বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার উদ্দাম নৃত্য দেখে। জাহাজ ডুবল কি তীরে ভিড়ল তাতে কিবা আসে যায়।

ভাগ্যাহত স্পেনের একটি পয়গাম

বিচারপতি আফযল চীমা সাহেব এই মাত্র তাঁর বক্তৃতায় ভাগ্যাহত স্পেনের কথা উল্লেখ করে আমার হৃদয়ের পুরানো ক্ষত তাজা করে দিয়েছেন। সৌভাগ্য বলুন কিংবা দুর্ভ্যাগ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঐ লীলাভূমিতে ভ্রমণের এবং তার মর্মন্তুদ ইতিহাস অধ্যয়নের সুযোগ আমার হয়েছিল। বিশ্বাস করুন, দু' একটি দেশ ছাড়া ইসলামী বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশই নিকট থেকে দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের হারানো স্পেনের রক্ত ভেজা মাটিতে পদার্পণ করা মাত্র আমার ব্যথা-বিহবল হৃদয় এক নতুন অনুভূতির পরশ পেল। মনে হলো এখানকার মৃদুমন্দ পুলক আমায় জড়িয়ে ধরছে, আবেশভরে ললাটে চুমু খাচ্ছে। ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার মুসলিম আত্মাগুলো আমাকে আলিঙ্গন করছে। প্রতিটি ধূলিকণা যেন আমাকে শোনাতে চাচ্ছে এক বিশেষ পয়গাম। মনে হলো ইসলামী বিশ্বের ভবিষ্যত সম্পর্কে যেন আমাকে সতর্ক করতে চাচ্ছে। প্রতিটি ধূলিকণা যেন বলছে ঃ দেখো, ইসলামী বিশ্বের আর কোন দেশে যেন এ মর্মন্তুদ নাটকের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আমার কথাগুলো তোমার

যিম্মায় আমানত রইল, যতদূর কুলায় ইসলামী বিশ্বের ঘরে ঘরে তা পৌঁছে দিও। কেননা এটা তোমাদের সবুজ উদ্যানের একটি ঝরা ফুলের পয়গাম। মনে রেখো, স্পেনের মত আরেকটি রক্তাক্ত অধ্যায় সংযোজনর আঘাত ইসলামের ইতিহাস আর সইতে পারবে না। তাই সে আঘাত ইতিহাস তোমাদের ক্ষমা করবে না। এ কথাগুলো মুখে উচ্চারণ করতেও হৃদয়ের গভীরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কিন্তু এটা আমাদের হারানো ফেরদাউসের পয়গাম। তাই ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি দেশে তা পৌঁছে দেওয়া আমার পবিত্র কর্তব্য।

ইসলামী বিশ্ব এক যুগসন্ধিক্ষণে

ইসলামী বিশ্ব এখন এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে উপনীত হয়েছে। পুরানো কাঠামো ভেংগে তার উপর চলছে এক নতুন অবকাঠামোর বিনির্মাণ। একটা জাতির জীবনে এ সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ই জাতির ভাগ্যে ঘটে পরিবর্তন। নতুন করে লেখা হয় জাতির ভাগ্যলিপি, শুরু হয় নতুন ধারা। তেমনি একটি যুগসন্ধিক্ষণই অতিক্রম করছে আজকের ইসলামী বিশ্ব। ইসলামী উম্মাহর আমূল ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এ সময় যেমন প্রয়োজন ঈমান ও বিশ্বাসের অবিচল শক্তির, তেমনি প্রয়োজন জীবন ও জগত সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়নের, নির্ভুল বিচার ও চিন্তাশীলতার, সময়োপযোগী পথ-নির্দেশনার, সর্বোপরি উম্মাহর ভবিষ্যত কল্যাণের পথে সীমাহীন আত্মত্যাগ ও কুরবানীর। এ ছাড়া সময়ের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়। বিশ্ব ইতিহাস অতীত ও বর্তমান যেমন এর জ্বলন্ত সাক্ষী, তেমনি ভবিষ্যতও প্রমাণ করবে এ অমোঘ সত্য। কুদরতের পক্ষ থেকে আজ আমাদের ঈমান ও আকীদার যেমন পরীক্ষা হচ্ছে, তেমনি পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের জাতীয় মেধা, বুদ্ধি ও কর্মকুশলতারও। আমাদেরকে আজ এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সফল রূপায়ণ ঘটাতে হবে। নতুন সমাজের অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। গোটা জাতীয় জীবনের সকল শাখা ও কর্মকাণ্ডকে টেনে সাজাতে হবে ইসলামের আলোকে। ইসলামাবাদ হোটেল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত কালকের সম্বর্ধনা সভায় আমি আরয করেছিলাম যে, আকীদা ও বিশ্বাসরূপে ইসলাম আজো বহাল রয়েছে, কিন্তু তার সংস্কৃতি ও জীবনবোধ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা

পাশ্চাত্যের এক কুটিল ষড়যন্ত্র। ওরা যখন দেখল যে, আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহকে বিচ্যুত করা সম্ভব নয়। ক্রুসেড যুদ্ধ থেকে শুরু করে স্পেনের মুসলিম নিধন যজ্ঞসহ বহু ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য জাতিবর্গ এ তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যে, আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলামী উম্মাহ খুবই সংবেদনশীল। অতীতের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তখন তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করল। তাদের নতুন কর্মপন্থা হলো, আকীদা ও বিশ্বাসের সংবেদনশীলতায় খোঁচা না দিয়ে অতি সন্তর্পণে ইসলামী উম্মাহকে ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত করা এবং আধুনিকতা ও প্রগতির নামে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। আমি মনে করি, পাশ্চাত্য তথা ইউরোপীয় জাতিবর্গ তাদের এ পরিকল্পনায় বড় রকমের সফলতাই লাভ করেছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ইসলামী বিশ্বে আকীদা ও বিশ্বাসের বিকৃতি তো ঘটেনি, কিন্তু তাহযীব-তমদ্দুন তথা ইসলামী জীবনধারায় নেমেছে প্রলয়ংকরী ধ্বংস। খৃস্টধর্মে অবশ্য আকীদা ও বিশ্বাসেরই বিকৃতি ঘটেছিল। হযরত 'ঈসা (আ)-র শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে সেন্ট পল প্রদর্শিত পথে শুরু হয়েছিল খৃস্টবাদের নতুনরূপে যাত্রা যার ফলে একত্ববাদের স্থান দখল করে নিল ত্রিত্ববাদ এবং আল্লাহ্‌র নবী ঈসা হয়ে গেলেন খোদার পুত্র। এভাবে প্রতিমা ভিত্তিক রোমান সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল একটি আসমানী ধর্মের সকল পবিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীতে ঘটনা পরিক্রমায় খৃস্টবাদের বিকৃতির গতি হয়েছে আরো তীব্রতর। প্রাচ্যের অলস ও ঘুমকাতর কাফেলার হাতে পড়লে অবশ্য খৃস্টবাদের এমন বিকৃত দশা ঘটত না। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিবর্গের অবস্থাই ছিল ভিন্ন। শক্তি তাদের উথলে পড়ছিল এবং অগ্রগতির অপ্রতিরোধ্য স্পৃহা জেগে উঠেছিল। গোটা জাতির ধমনীতে টগবগ করছিল জীবন যৌবনের তপ্ত খুন। কাজেই অন্যান্য ক্ষেত্রের গতি প্রতিযোগিতার সাথে তাল রেখে ধর্মের ক্ষেত্রেও বিচ্যুতি, বিকৃতি ও ভ্রান্তি সমান গতিতে চলছিল। বস্তুত যারা খৃস্টধর্মের বাহক ছিল এবং যে সকল জাতির সাথে খৃস্টধর্মের ভাগ্য জড়িত ছিল—তারা ধীর গতিতে মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। ইউরোপের বিশেষ পরিবেশ পরিমণ্ডল তাদের বাধ্য করেছিল বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে এবং অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামে যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে। কাজেই

গতি সঞ্চার হলো সবকিছুতেই। গতি সঞ্চার হলো খৃস্টধর্মের বিকৃতি ও বিচ্যুতির ক্ষেত্রেও। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে ইসলাম ধর্মে আকীদা ও বিশ্বাসের কোন বিকৃতি ঘটেনি এবং তা সম্ভবও নয়। কেননা স্বয়ং আল্লাহ্‌ হচ্ছেন ইসলামের মুহাফিজ। আল-কুরআন ইরশাদ করেছে :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

'আমিই অবতীর্ণ করেছি কুরআন এবং আমিই তার মুহাফিজ।' কিন্তু সংস্কৃতি ও জীবনধারার ক্ষেত্রে এসেছে আমূল পরিবর্তন। কেননা আকীদা ও বিশ্বাস এবং আদর্শ ও কর্মসূচী শূন্যে অবস্থান করে না। তার জন্য চাই অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ, চাই স্বাধীন গতি ও নিজস্ব উপকরণ। সর্বোপরি চাই আদর্শ-ভিত্তিক সমাজ সংগঠনের পর্যাপ্ত সুযোগ। আর ঠিক এ জায়গাটিতেই আঘাত করেছে আমাদের শত্রু অর্থাৎ আকীদা ও বিশ্বাসের সফল প্রয়োগের জন্য এবং তার সফলরূপে মহান ইসলামী নৈতিকতা ও জীবনধারার বিকাশ ঘটানোর জন্য যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন তা থেকে অতি সুকৌশলে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ইসলামী বিশ্বকে। ফলে অবিকৃত আকীদা ও বিশ্বাস ধারণ করেও ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুন থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে আজকের ইসলামী বিশ্ব। সেই ফাঁকে ইউরোপ অত্যন্ত সফলতার সাথে চাপিয়ে দিয়েছে তাদের তাহযীব ও তমদ্দুন।

ইসলামের জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন

স্বভাবগত দিক থেকে, বংশগত দিক থেকে এবং কর্মপন্থার দিক থেকে আমার আত্মার সম্পর্ক সেই আদর্শ ও আদর্শবাদী দলের সাথে যারা মাটির কোলে বসে নিরবে মুনাজাত করার চেয়ে ঘোড়ায় চড়ে আকাশের অসীম-তায় তকবীর ধ্বনি ছড়িয়ে দিতেই অধিক ভালোবাসে। আমি আমার পূর্বপুরুষ সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র) এবং তাঁর সিংহ-হৃদয়, আত্মত্যাগী মুজাহিদ সাথী দলের কথা বলছি, অকাতরে যাঁরা প্রাণ বিলিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র পথে, ইসলামী খিলাফত পুনপ্রতিষ্ঠার জিহাদে। ইসলামী ইতিহাসের নিকট অতীতে এমন দুঃসাহসী, অকুতোভয় পূর্ণাঙ্গ ও নিবেদিতপ্রাণ দ্বিতীয় কোন মুজাহিদ দল বা সংগঠনের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই পুণ্য দলের

সাথে সম্পর্কের সূত্রে আমি বিশ্বাস করি যে, ইসলামের জন্য ক্ষমতা ও রাজ-নৈতিক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে স্বাধীন পরিবেশের, মুক্ত সমাজের। আমি আরো বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌র এ ফরমান প্রথম দিনের মত আজো তেমনি অমোঘ সত্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত এক অমোঘ সত্যরূপেই তা বিদ্যমান থাকবে।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ —

"এরা এমন লোক যে, যদি পৃথিবীর বুকে আমি তাদের প্রতিষ্ঠা দিই, তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাতের বিধান চালু করবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"

ভেবে দেখুন, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ আবেদন, অনুরোধ ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে 'আদেশ' ও 'নিষেধ' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছে। আরবী ভাষার শব্দসম্ভার এতটা অকিঞ্চিতকর নয় যে, 'আদেশ' ও 'নিষেধ' শব্দ দুটি ছাড়া অনুনয় ও বিনয়সূচক কোন শব্দই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা সত্ত্বেও বেছে বেছে কেবল 'আদেশ' ও 'নিষেধ' শব্দ দুটিই ব্যবহার করা হয়েছে সর্বত্র। আর আদেশ ও নিষেধের জন্য প্রয়োজন শক্তি, প্রয়োজন ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা—যার ফলে আমরা আত্ম-বিশ্বাস ও সাহসিকতার সাথে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারব। নির্ভয়ে বলতে পারব—এটা ন্যায় কিংবা অন্যায়, এটা করতে হবে আর এটা করা চলবে না, "এমন করলে ভালো হতো।" "আমরা অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে" এগুলো আদেশ ও নিষেধের ভাষা নয়। তাবলীগ ও আবেদনের ভাষা যথাস্থানে অবশ্যই প্রযোজ্য। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহ্‌ই হচ্ছে ইসলামের মানদণ্ড। আর কুরআন সুন্নাহ্‌র শব্দ হলো আদেশ ও নিষেধ। সুতরাং মুসলমানদেরকে শক্তি, ক্ষমতা ও নির্ভরতার এমন স্তরে অবশ্যই উন্নীত হতে হবে, যেখান থেকে আজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞা জারি করা সম্ভব। কেননা মানব স্বভাব তোষামোদে প্রীত ও তুষ্ট হয় সত্য কিন্তু আল-কুরআনের ভাষায় সালাত কায়েম করা, যাকাতের বিধান চালু করা, ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের

প্রতিরোধ করার মত উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া মানব গোষ্ঠীর সার্বিক সংশোধন ও পূর্ণশুদ্ধি কিছুতেই সম্ভব নয়।

তবে শাখার উপরই সব নির্ভর করে

যদিও আমার সম্পর্ক ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জিহাদে জীবন উৎসর্গ-কারী সেই মুজাহিদ দলের সাথে, যদিও আমি শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজনীয়-তায় বিশ্বাসী, তবু আমি এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করব যে, গাছের যে শাখায় আমরা আমাদের নীড় রচনা করব সে শাখার প্রতি সর্বদা নিবদ্ধ রাখতে হবে আমাদের সযত্ন দৃষ্টি। কেননা শাখার ধারণ ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে নীড় রচনার সাধনায় আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতা। কেননা শাখা তরতাজা ও মযবুত থাকলে তবেই প্রশ্ন আসে নীড়টি কি ধরনের হবে—বুল-বুলির হবে না বাবুই পাখীর হবে। শাখাই যদি না থাকে কিংবা ভেঙ্গে গিয়ে থাকে, তখন নীড় কি ধরনের হবে সে প্রশ্নই অবান্তর।

যে শাখার উপর আমরা আমাদের নীড় রচনা করতে চাই, তা হলো আমাদের বিদ্যমান সমাজ ও চলমান সমাজ জীবন। শহরের জনস্রোত, হাট-বাজারের দোকানদার খরিদ্দার, কলকারখানার মালিক শ্রমিক, কৃষি-জীবী, পেশাজীবী, শিক্ষাজীবী ও বুদ্ধিজীবী—এক কথায় সর্বস্তরের মানুষ হলো সেই সমাজের বাসিন্দা। এরাই হলো সমাজ জীবনের স্পন্দন, নগর সভ্যতার প্রাণ চাঞ্চল্য। এরাই হলো দেশের মূল প্রাণশক্তি। সুতরাং আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে সমাজ জীবনের গতি-প্রকৃতি কি? সমাজবাসিন্দাদের পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি কি? তাদের রুচি ও অনুভূতি কোন্ মুখী? নীড় রচনা ও তার ভার বহনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাদের মধ্যে কি পরিমাণ রয়েছে? কোন নিরাপদ ভূখণ্ডের উপর যত সুউচ্চ ইমারত ইচ্ছে হয় তৈরী করুন। কিন্তু গাছের কোন শাখায় নীড় রচনা করার মুহূর্তে আপনাকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে উপরের প্রশ্নগুলো তলিয়ে দেখতে হবে। শাখা যদি শুকনো ও দুর্বল হয়, শাখা যদি নীড়ের ভার বহনে অক্ষম হয়, শাখা যদি বিদ্রোহ করে বসে তবে যে আমাদের সুদীর্ঘ সাধনা, সযত্ন প্রয়াস সবই নিরর্থক। মোট কথা, সবকিছু নির্ভর করে সমাজের গতি-প্রকৃতি ও ধারণ ক্ষমতার উপর। সমাজ জীবনের দাবী কি? বিশ্বাস ও নৈতিকতার বিচারে সমাজ কোন স্তরের? জীবনের মৌলিক বিষয়াদি, মূলনীতিমালা এবং মানবতার প্রাথমিক শর্তগুলো সেখানো রয়েছে কিনা।

অথচ আজকের সমাজ-জীবনের বাস্তব চিত্র এই যে, অন্যায়ের প্রতি অনুরাগ, পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ এবং প্রবৃত্তির গোলামী তার স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। ডাঙায় তোলা মাছ যেমন ছটফট করে, আমাদের বর্তমান সমাজও সংস্কার ও সংশোধনের আহবানে খোদা-ভীতি ও সৎ জীবন যাপনের ডাকে এবং অশ্লীলতা ও পাপাচার বর্জনের চাপ প্রয়োগে ডাঙায় তোলা শ্বাসরুদ্ধ মাছের মত ছটফট শুরু করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে হযরত লূত (আ.)-এর কওমের কথা বলা যেতে পারে। পৃথিবীর সেরা কথাশিল্পী ও অলংকার শাস্ত্রবিদকেও শ্রদ্ধাবনত হতে হয় আল-কুরআনের অলৌকিক বর্ণনাশৈলীর সামনে। একটি বিকৃত রুচির পচন ধরা সমাজের মনোভাব ও অনুভূতি কত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে আল-কুরআন।

اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون

"তোমাদের বস্তি থেকে লূতের অনুসারীদের বের করে দাও ; ওদেরকে ভালো লোক মনে হচ্ছে।"

গোটা সমাজ যেন চিৎকার জুড়ে দিল এবং লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বলে উঠল, "অত ভাল লোক দিয়ে আমাদের কাজ নেই। সাধুদের স্থান নেই এ সমাজে। বের করে দাও ওদের। আমরা তো পংকিলতায় আকণ্ঠ ডুবে আছি। পংকিলতার জীব আমরা, এতেই আমরা অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। সুতরাং পবিত্রতা ও সাধুতার যে ঢল নেমে আছে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।

সমাজের এহেন রুচিবিকৃতি এবং সমাজ জীবনের এহেন পাপাচারমুখী ধারা-প্রকৃতি উপেক্ষা করে বৃহত্তর সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোন কোণায় বসে কাগজের পৃষ্ঠায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার যত সুন্দর ও নিখুঁত চিত্রই আঁকা হোক না কেন, সেই সমাজে তার সফল প্রয়োগ কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং নীড় রচনার পূর্বেই আপনাকে ভেবে দেখতে হবে শাখার অবস্থা। যদি ডাল কাটার জন্য হাজার কুড়াল উদ্যত হয় আর তাতে নীড় রচনা করতে উদ্যোগী হয় মাত্র দু' একজন লোক, তবে যত যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী তারা হোক, উপকরণ ও সরঞ্জাম তাদের হাতে যত পর্যাপ্তই হোক, হাজার জনের কুঠারাঘাতের মুকাবিলা তাদের নীড় রচনার

এ প্রচেষ্টা তথা সমাজ সংস্কারের এ গঠনমূলক তৎপরতা সফলতার মুখ দেখবে না কোনদিন। কিছু লোক দেওয়াল গাথার কাজে নিয়োজিত আর কিছু লোক দেওয়াল ভাঙার কাজে তৎপর—এরূপ ক্ষেত্রে কোন ইমারত তৈরী হতে পারে না।

সমাজ হলো ক্ষেত্র

সমাজকে মনে করা যেতে পারে জমি বা ভূখণ্ড। জমি যদি উপযোগী হয় তবে তাকে উদ্দিষ্ট কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু সমাজ যদি কুরআনের ভাষায় অপসৃয়মাণ ও স্থানান্তরগামী বালুটিলার মত হয়, এমন যে, বাতাস এলো, বালু উড়িয়ে নিয়ে গেল। আজ দেখা গেলো উঁচু টিলা, হঠাৎ মরুবাতাস এসে তা সমতলে পরিণত করে দিল। সমাজের অবস্থা এমন চলমান বালুর ন্যায় হলে যে কোন চতুর ও ধূর্ত লোক সে সমাজকে বিপথগামী করতে পারে অতি সহজে। খড়-কুটার মত ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারে যে কোন দিকে। কেননা সে সমাজের বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না বরং বাতিল শক্তি ও ভ্রান্ত আন্দোলন এবং ভুল দর্শন ও মতবাদের সহজ শিকারে পরিণত হওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।

আজ বাস্তব অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, মুসলিম বিশ্বের কোথাও এমন একটি ইসলামী সমাজ নেই, যার উপর পূর্ণ ভরসা করে আপনি ইসলামী বিধান প্রবর্তনের দুরূহ কাজে এগুতে পারেন। সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী! হয়ত সকলে আমার সাথে একমত হবেন না। তবু আমি জামাল আবদুন নাসেরের কথা বলতে চাই। এই সেদিনের কথা, মিসরে জামাল আবদুন-নাসেরের ক্ষমতার তখন স্বর্ণযুগ। অবস্থা দেখে মনে হতো মিসরে বুঝি এমন একটিও প্রাণী নেই, যার নাসেরের সাথে কোন বিষয়ে দ্বিমত আছে। গোটা মিসর যেন নাসেরের নামে মাতোয়ারা। উষ্ণ করতালি আর গগনবিদারী জয় ধ্বনিতে লক্ষ জনতা ভেঙে পড়ত নাসেরের গাড়ীর পেছনে। এমনি সর্বপ্লাবী ছিল তার জনপ্রিয়তা। মনে হতো দেবতার আসনে বসিয়ে বন্দনা করতে পারলেই বুঝি মিসরীয়দের মন ভরে। কিছুদিন পর যখন মিসর-বাসীদের মোহ ভঙ্গ হলো—দেখা গেল সব ফাঁকা, সব অন্তসারশূন্য। এখন তো মুখ না ভেংচিয়ে কেউ তার নাম উচ্চারণ করতেও রাযী নয়। মুসলিম বিশ্বে চলমান বালুটিলার ন্যায় এমন সমাজের আরো অসংখ্য নযীর রয়েছে,

যে কোন সুচতুর ব্যক্তি তার ছলনা দিয়ে সেখানকার বিশিষ্ট সাধারণ সকলকে এমন মোহগ্রস্ত করে ফেলতে পারে যে, তার পানে লুটিয়ে পড়তেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেনা কেউ। এ অবস্থা খুবই বিপদজনক ও ভয়াবহ।

ইসলামী শরীয়তের আশু বাস্তবায়ন চাই

ইসলামী আইন প্রণয়ন এবং শরীয়ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে মোবারক উদ্যোগ-আয়োজন বর্তমানে আপনাদের দেশে চলছে, সে ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা আদৌ আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। এমন ভুল ধারণা করার অনুমতি আমি আপনাদের দেব না। কেননা এ মহান প্রচেষ্টার পথে মুহূর্তের বাধা সৃষ্টিকেও আমি মনে করি জঘন্যতম অপরাধ। আমার উদ্দেশ্য শুধু এ বাস্তবতাকে তুলে ধরা যে, সমাজ ও তার জীবনধারার উপরই নির্ভর করে যে কোন প্রচেষ্টার সফলতা।

সমাজ যদি আমাদের পদক্ষেপকে স্বাগত জানায়, ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবৃন্দ, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রেডিও, টেলিভিশন, —মোট কথা, সকল প্রচার মাধ্যমে যদি আমরা একযোগে প্রচেষ্টা চালাই এবং পছন্দ-অপছন্দ, রুচি-অভিরুচি ও অনুভূতি-উপলব্ধির পরিবর্তন ঘটিয়ে যদি আমরা সমাজ জীবনের সর্বত্র সততা, খোদাভীতি, ভাবতন্ময়তা ও ধৈর্য-সহনশীলতা সৃষ্টি করতে পারি, পারি যাবতীয় প্রলোভন ও নৈতিকতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে, তখন এ সমাজের উপর যে কোন কঠিন বোঝা চাপানো যেতে পারে। ইসলামী খিলাফতের গুরুভারও তখন সে বহন করতে পারবে স্বচ্ছন্দে। এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সমাজ সংশোধনের কাজে সমাজের বুকে প্রভাব সৃষ্টিকারী সবক'টি শক্তি যদি একযোগে সহযোগিতার ভিত্তিতে কিছু সময় নিয়োজিত থাকে, তবে ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ লালিত স্বপ্নও বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারে। অথচ বর্তমান অবস্থা এই যে, দেশের সবকটি প্রচার মাধ্যম তাদেরই হাতের মুঠোয় এবং সমাজ জীবন তাদেরই নিয়ন্ত্রণে, যাদের সম্পর্কে আল-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

"যারা ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটাতে চায় পরকালে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ্ই জানেন ; তোমরা জানো না।"

(বর্তমান পৃথিবীর বৃহত্তর পরিসরে) এ আয়াতটি এক জীবন্ত মু'জিযা। (কারণ আয়াতের ব্যাপক অর্থ আজ বাস্তব জগতে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে) আয়াত অবতরণ কালে মদীনার সীমিত সমাজ পরিসরে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। মজলিসে মজলিসে তার সরস আলোচনা হচ্ছিল। অবশ্যই ঘটনাটি হৃদয়-বিদারক ছিল। কিন্তু আয়াতের ব্যাপকতা ছিল আরো অধিক। যুগ ও শতাব্দীর সীমানা পেরিয়ে ইতিহাস ও ভূগোলের ব্যবধান ডিংগিয়ে এ আয়াত আরো ব্যাপক প্রেক্ষাপট, আরো গভীর ভাব ও মর্মের অনুসন্ধান করছিল। আজ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি আয়াতের ব্যাপক তাফসীর।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا

'যারা ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটাতে চায়', আধুনিক যুগের পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন, গল্প-উপন্যাস তথা নগ্ন সাহিত্য, ছায়াছবি ও ব্লুফিল্মের ছড়াছড়ি। এসব যে আলোচ্য আয়াতের শুধু তাফসীরই নয় বরং বাস্তব চিত্রও তুলে ধরেছে বিশ শতকের মানুষের কাছে, যা কল্পনা করাও অতীতের অন্য কোন সময় ছিল সুকঠিন। মদীনার সে পরিবেশে লোকেরা হয়তবা ঈমান বি'ল-গায়বের আশ্রয় নিয়েছিল কিংবা বিশেষ কোন ঘটনার সাথে আয়াতের সামঞ্জস্য খুঁজে নিয়েছিল। কিন্তু দুনিয়ার সকল শয়তানী শক্তি আজ যে ভাবে أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ তথা অশ্লীলতার প্রচার-প্রসারে আদাজল খেয়ে লেগেছে তা কি পূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পেরেছিল?

ধীরগামী কচ্ছপ ঘুমিয়ে, দ্রুতগামী খরগোশ কর্মে

বন্ধুরা! শৈশবে আমরা সকলে কচ্ছপ ও খরগোশের দৌড় প্রতিযোগিতার মজাদার কাহিনী পড়েছিলাম। দ্রুতগামী অথচ অলস খরগোশ কিছুদূর গিয়ে

ঘুমিয়ে পড়ল, পক্ষান্তরে ধীরগামী অথচ পরিশ্রমী ও কর্মনিষ্ঠ কচ্ছপ বিরাম-হীনভাব পথ চলে প্রতিযোগিতায় জিতে গেল। এ তো হলো কাহিনীর খরগোশ বনাম কচ্ছপ প্রতিযোগিতা। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজও প্রতিদ্বন্দ্বিতা খরগোশ কচ্ছপেই চলছে, তবে ধীরগামিতা সত্ত্বেও কচ্ছপ ঘুমিয়ে আছে, পক্ষান্তরে বিস্ময়কর দ্রুতগামিতা সত্ত্বেও খরগোশ জাগ্রত ও কর্ম-তৎপর। পৃথিবীর ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলো হচ্ছে আধুনিক যুগের সেই খরগোশ আর আমাদের অবস্থা ঘুমন্ত কচ্ছপের চেয়েও করুণ। বর্তমান বিশ্বের কল্যাণ-কামী ও ধ্বংসপ্রয়াসী শক্তিগুলোর মাঝে তুলনা করে দেখুন। সর্বত্র আপনি দেখতে পাবেন খরগোশ কচ্ছপের এ আধুনিক প্রতিযোগিতা।

নৈতিক অধঃপতন ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাধ্যমে মানবতার ধ্বংস তরা-ন্বিত করার অপপ্রয়াসে পৃথিবীর সকল অপশক্তি আজ একযোগে মাঠে নেমেছে। প্রচার মাধ্যমসহ যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা, উপায়-উপকরণ আজ তাদের দখলে। ফলে অবলীলাক্রমেই তারা চালিয়ে দিতে পারে রাতকে দিন এবং দিনকে রাত বলে, আলোকে অন্ধকার এবং অন্ধকারকে আলো বলে। অপর দিকে ছিঁটে-ফোঁটা কল্যাণ ও গঠনমূলক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো ভুগছে সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণের দৈন্যে, তাদের না আছে মানুষকে আকর্ষণ করার কোন সম্মোহন শক্তি আর না আছে সিদ্ধান্ত প্রয়োগ ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নের কোন ক্ষমতা।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আজ অত্যধিক গুরুতর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ ভুল ধারণা মানুষের মনে আজ শিকড় গেড়ে বসেছে যে, সমষ্টি ও সংগঠনই আজকের সমাজের মূল প্রয়োজন। ব্যক্তি এখানে বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ নয়। কেননা আধুনিক যুগ হচ্ছে সংগঠনের যুগ। সংঘবদ্ধতার যুগ। সমাজ-দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞানের নামে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার এমনই প্রচার করা হয়েছে যে, ব্যক্তির প্রশ্ন মানুষের চোখে এখন একেবারেই গৌণ হয়ে পড়েছে। সবার মগজে একথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, স্বস্থানে প্রতিটি ব্যক্তি যত অসম্পূর্ণ ও দোষযুক্তই হোক অনেক ব্যক্তি যখন একত্রিত হবে এবং তাদের সমন্বয়ে একটি সংগঠন জন্মলাভ করবে, তখন সংগঠনের সুবাদে তা হবে কল্যাণকর ও ফলপ্রদ। যুক্তিটা কতকটা যেন এ ধরনের— কাষ্ঠখণ্ড নিম্নমানের হোক কিংবা ঘুনে ধরা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা সবগুলো কাষ্ঠখণ্ড একত্রিত করে যখন নৌকা বা জাহাজ তৈরী হবে তখন

সমন্বয়ের বদৌলতে তা হয়ে যাবে দোষমুক্ত ও নিখুঁত। প্রতিটি কাষ্ঠখণ্ডের স্বতন্ত্র দোষ বিলীন হয়ে যাবে সমষ্টির গুণে। উদাহরণরূপে বলা যেতে পারে যে, ডাকাতরা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকবে, ততক্ষণ তারা ডাকাতরূপে গণ্য হবে। কিন্তু সেই ডাকাতরা যদি দলবদ্ধ হয়ে সংগঠন তৈরী করে নেয় তখন তারা ভক্ষকের পরিবর্তে রক্ষক হবে এবং চোরেরা যদি কোন সমিতিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তবে তারা লাভ করবে চৌকিদারের মর্যাদা। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেই চোর। এ অদ্ভুত যুক্তি কিছুতেই আমি হজম করতে পারি না যে, একজন ডাকাতকে ডাকাত বলা হলে একশ জন ডাকাতের সংঘবদ্ধ দলকে কেন ডাকাত বলা হবে না। কি গুণগত পরিবর্তন এসেছে তাদের মধ্যে? সংঘবদ্ধ ডাকাতদল তো নাগরিক জীবন ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অধিক হুমকিরই কারণ হবে।

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর অবস্থাও অভিন্ন। ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার সরকারগুলোর কথাই ধরুন কিংবা প্রাচ্যের সরকারগুলোর প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। চরিত্রহীন, নৈতিকতাবর্জিত স্বার্থান্ধ ও অর্থলোলুপ কিছু লোক একজোট হয়ে একটি সামা-জিক ব্যবস্থা ও কাঠামো তৈরী করেছে এবং সেই সমাজ ব্যবস্থা ও কাঠামোর মাধ্যমে গোটা জাতির ভাগ্য নির্ধারণের মালিক মোখ্‌তার সেজে বসেছে।

ইসলামের তূণীরে একটি মূল্যবান তীর

এদেশে আপনাদের সামনে আল্লাহ্ পাক এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছেন। এদেশের বাসিন্দাদের অন্তরে এ অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে যে, দেশের সমাজ কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তন করা উচিত। সেই সাথে দেশ শাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাও ইসলামী শরীয়তের হাতে ন্যস্ত হওয়া উচিত। এটা অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ ও বরকতপূর্ণ অনুভূতি এবং তা প্রদেশবাসীর প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ। আমি বিশ্বাস করি যে, এটা নিছক কাকতালীয় ব্যাপার নয়; বরং আল্লাহ্ পাকের বিশেষ ইচ্ছা ও ফয়সালা এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে। এক মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এদেশ অর্জিত হয়েছিল। সে কারণেই আল্লাহ্ পাক আরেকবার আপনাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমার আন্তরিক পরামর্শ, আল্লাহ্‌র দেয়া এ সুবর্ণ সুযোগকে নেয়ামতরূপে গ্রহণ করুন এবং গোটা জাতি এক দেহ হয়ে ইসলামী উম্মাহর কল্যাণে এর সদ্ব্যবহার করুন।

সেই সাথে আমি সুধীমণ্ডলীর সতর্ক দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই যে, তূণীর থেকে তীর নিক্ষিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সেই তীরের কার্যকারিতা সম্পর্কে মানুষের মনে সুধারণা বিদ্যমান থাকে, তার উপর নির্ভর করা যেতে পারে এবং মানুষের মনে ভীতিও সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু ধনুক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে শুধু বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা---অন্য কিছু নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, 'শরীয়ত ব্যবস্থা, প্রবর্তনের দাবী হচ্ছে ইসলামের তূণীরে একটি মূল্যবান তীর। আর ইসলামী শরীয়ত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন আমার দৃষ্টিতে শুধু কতগুলো দণ্ডবিধি জারি করাই নয়, বরং শরীয়ত ব্যবস্থা প্রবর্তন কথাটি খুবই ব্যাপক অর্থ বহন করে। এজন্যই কোন দেশের সার্বিক অবস্থা এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্য ও মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত না হয়ে সমর্থনসূচক বক্তব্য প্রদানে সম্মত নই।

মোটকথা, বিশ্ববাসীকে এতদিন একথাই বলা হয়েছে যে, ইসলামের তূণীরে 'শরীয়ত ব্যবস্থা' নামক একটি তীর রয়েছে, যা ব্যবহার করা হলে বিশ্বমানবতার জন্য খুলে যাবে সৌভাগ্যের দুয়ার। অজস্র ধারায় নেমে আসবে কল্যাণ ও বরকত। এ তীর যতদিন তূণীরে রক্ষিত আছে, ততদিন শত্রুর মুখ ও কলম নিশ্চুপ থাকবে। আমাদের কৈফিয়ত দেওয়ার অবকাশ থাকবে যে, কোথাও তো শরীয়ত ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ প্রবর্তন হচ্ছে না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটছে না। সুতরাং কি করে কল্যাণ ও বরকতের আশা করা যেতে পারে। কিন্তু ধনুক থেকে তীর নিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর কৈফিয়তের আর কোন অবকাশ থাকে না। আরো মনে রাখতে হবে যে, এ মূল্যবান তীর একবারই শুধু ব্যবহার করা যেতে পারে। ইতিহাসের অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে আমি আপনাদের বলছি---এ তীর বারংবার ব্যবহারযোগ্য নয়। এ তীর একবার নিক্ষেপ করে পুনরায় তূণীরে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, বিষয়টি যেমন খুবই নাযুক, তেমনি সময়টিও খুবই সংকটপূর্ণ। এমন এক মহতী অনুষ্ঠানে---যেখানে দেশের প্রধান বিচারপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যবর্গ এবং বিশিষ্ট আলিম ও বুদ্ধিজীবীবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন---পূর্ণ দায়িত্বের সাথে আরয করছি যে, শুধু পাকিস্তানের ইতিহাসেই নয় বরং গোটা ইসলামী বিশ্বের ইতিহাসে আজ খুবই নাযুক ও সংবেদনশীল এক মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেই উৎকন্ঠিত প্রতীক্ষায় মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকে। পরীক্ষা-

নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সফলতার সম্ভাবনা যেমন থাকে তেমনি থাকে ব্যর্থতার সমূহ আশংকাও। বস্তুত সফল ও ব্যর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমষ্টিই হচ্ছে মানব জীবন। সমস্যাসংকুল জীবনের বন্ধুর পথে মানুষ হোচট খায়, আবার সামলে নেয়। পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। এভাবেই নির্দিষ্ট একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে জীবন। ব্যক্তির জীবনে এটা যেমন সত্য তেমনি জাতির জীবনেও তা অমোঘ সত্য। ইতিহাসের অতল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মুখে জাতির 'প্রাণতরী' একবার তলিয়ে যায়, আবার উপরে ভেসে উঠে। এটাই প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় বিধান। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে একটা জাতির ব্যর্থতা ততটা ক্ষতিকর নয়, যতটা ক্ষতিকর আগামী দিনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া। সুতরাং আপনাদেরকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে ভেবে দেখতে হবে যে, যে মহান পদক্ষেপ আপনারা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সে গুরুভার বহন করার যোগ্যতা এবং তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানানোর মনোভাব রয়েছে কিনা। এজন্যই বারবার অত্যন্ত জোর দিয়ে আমি একথা বলছি যে, সমাজ সংস্কারের কাজ ব্যাপক পর্যায়ে শুরু হওয়া উচিত। মসজিদের মিম্বর থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যালারী থেকে, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অংগন থেকে, রেডিও-টেলিভিশন সহ সরকারী-বেসরকারী সকল প্রচার মাধ্যম থেকে এমন কি রাজনৈতিক বক্তৃতার মঞ্চ থেকেও একযোগে শুরু হতে হবে সে উদ্যোগ। কেননা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি শিকড় গেড়ে বসে থাকে ঘুষ-দুর্নীতি, জুলুম-অবিচার, মানুষের হৃদয় যদি হয়ে যায় পাষাণ, যদি লোপ পেয়ে যায় সহমর্মিতা ও সহানুভূতি এবং হিতাকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ কামনার মত সদগুণাবলী---তবে বুঝতে হবে এ জাতির জন্য (এবং তার পরিণতিতে গোটা ইসলামী বিশ্বের জন্য) অপেক্ষা করছে এক ভয়াবহ দুর্যোগ।

স্পেন থেকে কেন বিতাড়িত হলাম

স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়---অন্যান্য ভুল-ভ্রান্তিসহ বড় কারণ ছিল ইসলামের প্রতি তাদের উপেক্ষার আচরণ। বস্তুত চরিত্র, আদর্শ ও শিক্ষার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে তারা কখনই সচেষ্ট হয়নি। ফলে তাদের প্রভাবক্ষেত্র উত্তর দিকে সম্প্রসারিত হওয়ার পরিবর্তে ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে এসেছে দক্ষিণে। খৃস্টান জনগোষ্ঠীকে তারা কাছে টেনে নেয়নি। ইসলামের সুমহান আদর্শ ও

চরিত্র তাদের সামনে তুলে ধরেনি। ইউরোপের কেন্দ্রস্থলের দিকে তারা নযর দেয়নি এবং নিজেদের সমাজ ও পরিবেশের সংস্কার সংশোধন সম্পর্কেও যত্নবান হয়নি। তারা বরং ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল মনোরম সৌধ নির্মাণে এবং স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে। রসশাস্ত্র তথা ললিত-কলা, কাব্য ও সঙ্গীত চর্চায় তারা ছিল মশগুল। সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, তারা ছিল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের শিকার। রবিয়া, মুদার, ইয়ামানী ও হিজাযী ইত্যাদি গোত্রীয় কোন্দল ছিল তুঙ্গে।

ভাষা সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক ও বর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কিংবা সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে এমন কাল ব্যাধি, যা একটা জাতিকে দ্রুত ঠেলে দেয় নিশ্চত ধ্বংসের দিকে। তাই আল-কুরআন আমাদের সতর্ক করে দিয়ে ইরশাদ করেছে ঃ

لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم

و لا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن و لا تلمزوا

انفسكم و لا تنابزوا بالالقاب -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা এক বংশের লোকেরা অন্য বংশের লোকদের উপহাস করো না। হতে পারে এরা ওদের চেয়েও উত্তম। বিশেষত মেয়েরা যেন অন্য মেয়েদের সমালোচনা না করে। হতে পারে এরা ওদের চেয়ে উত্তম এবং নিজেদের দোষারোপ করো না এবং একে অপরের জন্য মন্দ নাম ব্যবহার করো না।"

স্রষ্টার পক্ষ থেকে এ পরামর্শ ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়। দেশ, সমাজ ও জাতির জন্যও একথা প্রযোজ্য। এসব ধ্বংসাত্মক ব্যাধি কতশত জাতির পতন ঘটিয়েছে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে তার কোন ইয়ত্তা নেই। পাকিস্তানে হিজরতকারী আমার ভারতীয় বন্ধুদের আমি বলেছিলাম—আপনারা নতুন দেশে যাচ্ছেন, ভালো কথা ; কিন্তু মন থেকে আপনাদের এ অহংবোধ অবশ্যই দূর করতে হবে যে, আমরা হলাম মূল ভাষাভাষী, আমাদের রয়েছে স্বতন্ত্র

কৃষ্টি ও লোকাচার। আমাদের আচরণই হচ্ছে সভ্যতার মাপকাঠি। এসব ঘৃণ্য অহমিকা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন এবং সেখানকার আদি বাসিন্দাদের সাথে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিলে মিশে একাকার হয়ে যান।

বিশ্ব দরবারে নিজের ভাবমূর্তি সমুন্নত করা এবং ইসলামী উম্মাহর কল্যাণে কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা পাকিস্তানের পক্ষে তখনই সম্ভব, যখন এখানে প্রতিষ্ঠিত হবে ভাষা-বর্ণ ও আঞ্চলিক বিভেদ ও ভেদাভেদ-মুক্ত এক আদর্শ সমাজ। এই সাম্প্রদায়িক বিষই ছড়িয়ে পড়েছিল স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে। ফলে খৃস্টবাদের যে খড়গ তাদের মাথার উপর ঝুলছিল সে কথা বিস্মৃত হয়ে তারা লিপ্ত হলো বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও গোত্রীয় প্রাধান্য কায়েমের প্রতিযোগিতায় এবং গোত্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায়। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই—এ ধরনের আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড পাকিস্তানের মাটিতে যেন কোন অবকাশ খুঁজে না পায়। এমন বিশিষ্ট মজলিস এবং এমন শোভনীয় পরিবেশ হয়ত আমি আর পাব না, তাই হৃদয়ের সবটুকু ব্যথা ও দরদ ঢেলে দিয়ে আপনাদের খিদমতে এ হিতাকাঙ্ক্ষা-মূলক পরামর্শ পেশ করছি। সর্বশক্তি দিয়ে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা প্রতিরোধ করুন। তবে শক্তি প্রয়োগ কিংবা কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ—তা প্রতিরোধের পন্থা নয়। আফজাল চীমা সাহেবের সুরে সুর মিলিয়ে বলব, ইসলামী ঐক্য, সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শুধু আমরা পারি সাম্প্রদায়িকতার কবর রচনা করতে। আমি আবার বলব—ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু যেন অন্তত পাকিস্তানের মাটিতে শিকড় গাড়তে না পারে।

আমি মনে করি—সারা বিশ্ব আজ দুটি মাত্র শিবিরে বিভক্ত। ইসলামী শিবির এবং কুফরী ও ধর্মহীন শিবির। এ ব্যাপারে কারো চিন্তায় সামান্যতম বিচ্যুতি কিংবা কোনরূপ দ্বিধা-সন্দেহ থাকলে আমি আল-কুরআনের সেই ঐশী ঘোষণা আবার আপনাদের শুনিয়ে দেব, যা অবতীর্ণ হয়েছিল মদীনার উদীয়মান ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্যে। মদীনার বুকে যে নতুন ইসলামী সমাজের গোড়াপত্তন হচ্ছিল তা একদিকে যেমন আনসার মুহাজির তথা স্থানীয় ও বহিরাগত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তেমনি অন্যদিকে খোদ স্থানীয় আনসাররাও ছিল আওস-খাযরাজ—দুই প্রতিপক্ষ গোত্রে বিভক্ত। আনসার-মুহাজিরদের মাঝে রেষারেষি ও তিক্ততার ইতিহাস অতটা দীর্ঘ ছিল না, যতটা ছিল দুই আনসার গোত্র—আউস ও খাযরাজের মাঝে। সুদীর্ঘ চল্লিশ

বছর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তারা। সে যুদ্ধের জের তখনো অব্যাহত ছিল। উভয়ের চোখ ছিল রক্তবর্ণ। সামান্য একটি উসকানিমূলক কবিতা আবৃত্তিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত প্রতিশোধের দাবানল। একবারের ঘটনাঃ আউস খাযরাজের কোন এক যুক্ত মজলিসে জনৈক শঠ য়াহূদী এসে উদ্দীপনাময় উসকানিমূলক কবিতা আবৃত্তি শুরু করল। সাথে সাথেই পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। অসি কোষমুক্ত হওয়াই বাকি ছিল শুধু। সংবাদ পাওয়া মাত্র রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং উভয় পক্ষকে ইসলামের একতা ও ভ্রাতৃত্বের বাণী শোনালেন। ফলে হঠাৎ উসকে উঠা প্রতিহিংসার আগুন আবার নিভে গেল।

মদীনার সেই নবগঠিত শিশুসমাজের বিপক্ষে ছিল গোটা বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল আগ্রাসী শক্তি। একদিকে হচ্ছে বায়জেন্টাইন ও সাসানী সাম্রাজ্যদ্বয়। দূরবর্তী হিন্দুস্তান ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। অন্যদিকে এসবের বিপক্ষে ছড়িয়েছিল মাত্র হাজার কয়েক লোকের একটি ক্ষুদ্র সমষ্টি, বিন্দুর মত একটি সংগঠন, একটি ঐক্য, যার সম্পর্কে অতগুলো বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার কথা কল্পনা করা অতি বড় স্বপ্নবিলাসীর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাকেই কিনা সতর্কবাণী দেওয়া হচ্ছে এই বলে—তোমরা যদি তোমাদের ঐক্যে অবিচল না থাক, তোমরা যদি তোমাদের ভ্রাতৃত্ব মযবুত না কর, যদি তোমাদের মধ্যে এ বিষয়ে দেখা দেয় সামান্যতম অবহেলা, তাহলে তার পরিণতি হবে পৃথিবীর বুকে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা এবং সীমাহীন অন্যায়ের বিস্তার।

الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض و فساد كبير ـ

একটু বিবেচনা করে দেখুন---সাবিক মানবতার ভাগ্য পরিবর্তনে কোন অবদান রাখার যোগ্যতা নবগঠিত এ সমাজটির ছিল কি ? তবু এ ক্ষুদ্র সংগঠন, এ ক্ষুদ্রতম ঐক্যেই ছিল মুমূর্ষু মানবতার শেষ আশা-ভরসা। মদীনার সে ক্ষুদ্র সমাজই ছিল মানবতার মূলধন। এজন্যই তাদের প্রতি উচ্চারিত হয়েছে ঐশী হুশিয়ারী সংকেত। তোমাদের যদি ঘটে সামান্যতম বিচ্যুতি, আর তার ফলে তোমাদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বে ধরে ফাটল, তবে তার পরিণতিতে তোমরাই যে শুধু ধ্বংস হবে তা নয় বরং تكن فتنة فى الأرض و فساد كبير

পৃথিবীতে দেখা দেবে চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। পৃথিবী পরিণত হবে জ্বলন্ত এক নরককুণ্ডে। আমিও আপনাদের বলছি---আল্লাহ্ না করুন---পাকিস্তানের বুকে যদি এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং প্রতি মুহূর্তে সে আশংকা বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে মনে রাখুন---ধ্বংসের হাত থেকে পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই। আল্লাহ্ না করুন, পাকিস্তানের মাটিতে ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তবে পৃথিবীর আর কোন দেশে আল্লাহ্র কোন বান্দা ইসলামী শরীয়তের স্বপক্ষে আওয়াজ তোলার সুযোগ পাবে না কোন দিন।

আমি স্থির বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, পাশ্চাত্য জগতসহ গোটা-অমুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি এখন সেসব দেশের প্রতি নিবদ্ধ, যেখানে ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তনের দাবী ও আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। এ পরীক্ষা ব্যর্থ হলে শত্রুদের পথ নিষ্কন্টক হয়ে যাবে। তাই আমি আবারো আরয করব যে, আপনাদের সামনে এখন খুবই নাযুগ ও সংবেদনশীল মুহূর্ত। এখন আপনাদের করণীয় হলো পূর্ণ উদ্যম ও শক্তি, মেধা ও বুদ্ধি, মনোবল ও সাহসিকতা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর মনোভাব নিয়ে সকল বিভেদ ও বিভক্তি মুছে ফেলে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়া। আপনাদেরকে আজ ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে পাকিস্তানের স্বার্থ এবং আরো উর্ধ্বে উঠে ইসলামের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে হবে। উপরিউক্ত শর্তগুলো পূরণকরতে পারলে দেখবেন বিশ শতকের ইসলামী ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। এক স্বর্ণযুগের হবে উদ্বোধন। পাকিস্তানের পাক ভূমিতে জন্মলাভ করবে এমন এক আদর্শ সমাজ, যা দেখতে সারা বিশ্ব থেকে শুধু পর্যটকরাই নয়, দলে দলে গবেষক ও পর্যবেক্ষকরাও ছুটে আসবে আপনাদের দেশে, আর ফিরে যাবে আত্মার সজীবতা ও হৃদয়ের প্রশান্তি নিয়ে। স্বদেশবাসীদের কাছে তারা বলবে সেই সোনালী সমাজের গল্প—পাকিস্তানের পাক ভূমিতে আমরা দেখে এসেছি এমন এক আদর্শ সমাজ, যেখানে পাপ নেই, পংকিলতা নেই, লোভ নেই, লালসা নেই, নেই হিংসা ও বিদ্বেষ। সেখানে আছে পুণ্যের স্নিগ্ধতা, আছে আত্মার তৃপ্তি ও হৃদয়ের প্রশান্তি, আছে ভ্রাতৃত্ব-বোধ, সহানুভূতি ও সমবেদনা। খোদার পক্ষ থেকে সেখানে অজস্র ধারায় বর্ষিত হয় কল্যাণ ও বরকত এবং করুণা ও রহমত। পৃথিবীতে স্বর্গ যদি দেখবে তবে চল পাকিস্তানের পাক ভূমিতে।